শিক্ষামূলক অধ্যয়ন

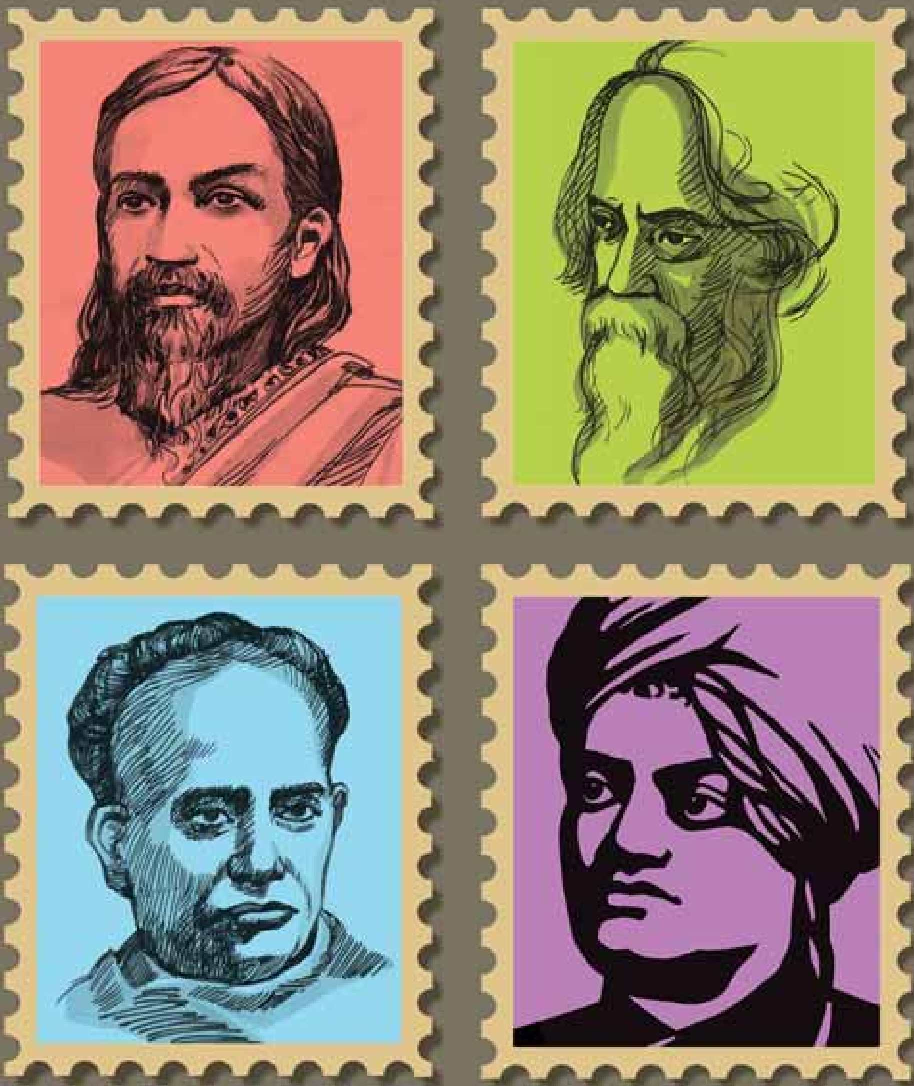

শিক্ষামূলক অধ্যয়ন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

প্রকাশক :

অধিকর্তা

‘‘রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ’’

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ISBN : 978-81-937413-7-5

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৮
পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০২৩

সম্পাদনা :

ড. রীতা সিংহ রায়

স্বামী নিঃস্বম্বলানন্দ গার্লস্ কলেজ

ভদ্রকালী, হুগলি

সঞ্চালক :

ড. কে. এ. সাদাত / নীলাঞ্জন বালা

প্রচ্ছদ : তমাল মোহান্ত

মুদ্রক :

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

মুখবন্ধ (Preface)

'শিক্ষামূলক অধ্যয়ন' (Educational studies) বিষয়টি NCTE-র ২০১৪ সালের নবনির্মিত পাঠক্রম অনুযায়ী সংগঠিত হয়েছে। এই বিষয়ের পাঠক্রমটি সম্পূর্ণকরণে দু-বছরের সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে এবং 'Diploma in Elementary Education' (D. El.Ed)-এর পাঠক্রমে যুক্ত করা হয়েছে। এই পাঠক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা অনুসারে শিক্ষার পরিবেশ ও পদ্ধতির রূপান্তর ঘটানো। আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ, পরিবেশ ও জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের প্রয়োজনে এই রূপান্তর একান্তই কাম্য। পাঠক্রমের নবনির্মাণ এবং পত্রটির সংযুক্তি মূলত এই পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সংঘটিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে, বইটির বিষয়বস্তু কোনোভাবেই শুধুমাত্র লিখিত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে শুধুমাত্র বিষয়ের রূপরেখা ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এই বিষয়ের রচনার প্রধান উদ্দেশ্য হল —

ক) বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়ের প্রতি একটি সার্বিক দৃষ্টিপাত করা।

খ) মানব প্রকৃতি, সমাজ, শিখন ও শিক্ষার লক্ষ্যের ক্ষেত্রে মৌলিক ধারণাগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা।

গ) শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানগুলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

ঘ) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার গুরত্ব এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান।

ঙ) শিক্ষক, শিখন ও শিক্ষণের মধ্যে ধারণা গঠন করবে।

চ) পাঠক্রম ও শিশুর জ্ঞান নির্মাণের বিভিন্ন পন্থাগুলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে।

ছ) বিদ্যালয় নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা, কার্যকারিতা ও তার মান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে।

এই বই-এর বিষয়বস্তু অনেকগুলি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলি (DIET) সক্রিয়ভাবে প্রকল্প নিয়েছেন ''Development of Teaching clarity''. এ প্রসঙ্গে সরকারি নির্দেশনামা 712-Edn (CS)/8T-17/79-এর (iii), (iv), (viii) ও (x) ধারা অনুসারে নতুন পাঠক্রম প্রয়োগ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। দক্ষিণ দিনাজপুর (10.8.15-14.8.15), উত্তর ২৪ পরগনা (24.8.15-28.8.15), হাওড়ায় (31.8.15-4.9.15) বিভিন্ন কর্মশালার মধ্যে দিয়ে জেলা শিক্ষা প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলি শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের এর সঙ্গে পরিচিত করায় এবং সর্বত্র লিখিত বিষয়বস্তু প্রকাশের দাবি ওঠে। এর প্রতি সম্মান জানিয়ে বর্ধমান জেলা শিক্ষা প্রশিক্ষণ সংস্থায় (2.1.16-9.1.16) নতুন কর্মসূচি শুরু করা হয় ''Instructional Material Design (development of teaching clarity for D.El.Ed) for teacher preparation.'' এই কর্মসূচির ফলাফল পরিমার্জন ও সংস্কার হয় হুগলি (11.2.16-15.2.16) পুরুলিয়া (10.3.16-12.3.16) এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা (21.4.16-27.4.16) রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের অধিকর্তার নেতৃত্বে বিভিন্ন জেলায় প্রাথমিক প্রয়োগ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রস্তুত বিষয়বস্তুগুলি চূড়ান্ত সম্পাদনা করা হয়। এই পর্যায়গুলি অতিক্রম করে আজকের এই পুস্তকের আবির্ভাব।

সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার জন্য রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (SCERT), বিভিন্ন জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা (DIET) তাদের অধ্যক্ষ থেকে প্রতিটি কর্মচারির নিরলস প্রচেষ্টার ফল এই বই। সকলের প্রচেষ্টা সার্থক হবে যদি শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচিতে এটি সাদরে গৃহীত হয়। যথার্থই শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুশিক্ষা অধ্যয়নের প্রয়োগের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াটির রূপান্তর ঘটলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যথার্থ শিক্ষিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এবং জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থার যৌথ গবেষণাধর্মী কাজের ফসল এই পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে নতুন ডি.এল.এড পাঠক্রমে উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাববোধ থেকে এই সংস্থা সরকারি নির্দেশনামা 712-Edn (cs)/8T – 17/79 তারিখ 21.05.1980 সেকশন (iii), (iv), (viii) ও (x) অনুসারে ''Development of Teaching Clarity'' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিল।

প্রকল্পের শুরুতেই সামগ্রিক পাঠক্রমকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলিতে কর্মশালা শুরু করা হয়েছিল। যেমন — (১) ব্যবহারিক বিষয়সমূহ (P-1, P-2, P-3, P-4) ও তার আদান-প্রদান কার্যবিধি — এই নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডায়েট, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০ আগস্ট, ২০১৫ থেকে ১৪ আগস্ট, ২০১৫। (২) পাঠক্রমের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুসমূহ (Core Curriculum CC-01, CC-02, CC-03, CC-04, CC-05) নিয়ে একইভাবে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডায়েট, উত্তর চব্বিশ পরগনাতে ২৪ আগস্ট' ২০১৫ থেকে ২৮ আগস্ট' ২০১৫ পর্যন্ত (৩) এরপর বিষয়জ্ঞান ও পাঠদান পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি (CPS-1, CPS-2, CPS-3, CPS-4) নিয়ে কর্মশালা হয় ডায়েট, হাওড়াতে ৩১ আগস্ট, ২০১৫ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত।

এই প্রতিটি কর্মশালায় উপস্থিত শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের মধ্যে থেকে যে কথাগুলি জোরালোভাবে উঠে এসেছিল, তা হল - "ডি.এল.এড-এর জন্য সঠিক শিখন-শিক্ষণ সামগ্রী প্রয়োজন"।

এই প্রয়োজনকে মাথায় রেখেই কোনোরকম সময় নষ্ট না করে ডায়েট, বর্ধমানে ২০১৬ সালে জানুয়ারির ২ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত শুরু হয়েছিল কাজ, যার নাম ছিল — "Instructional Material Design (development of teaching clarity) for Teacher Preparation". এই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ২০১৬ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ডায়েট, হুগলিতে। এরপর কাজগুলিকে নিয়ে পর্যালোচনা সংযোজন, বিয়োজনের কাজ চলে দু-দফায় — ১০ই মার্চ থেকে ১২ই মার্চ পর্যন্ত ডায়েট, পুরুলিয়াতে ও ২১ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল ডায়েট, দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে।

এই দীর্ঘ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে যে ফসল উৎপাদিত হল, তা আদৌ কতটা কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে শিক্ষক-শিক্ষণে, তা যাচাই করে দেখা ভীষণ জরুরি ছিল। এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে এই প্রকল্পের তথা রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানে পাইলট টেস্টিং-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পাইলট টেস্টিং এর কার্যকরী কৃৎকৌশল নির্মাণের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডায়েট, হাওড়াতে ২ মে' ২০১৬ থেকে ৪ মে' ২০১৬ তারিখে। এরপর পাইলট টেস্টিং-এর অংশ হিসেবে একমাস ধরে রাজ্যে চারটি ডায়েটে-কোচবিহার, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়ায় রাজ্যের প্রায় সকল ডায়েটে কর্মরত শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে এই শিখন সামগ্রী শিক্ষার্থীদের কাছে প্রয়োগ করা হয়। এই পাইলট টেস্টিং সার্থকতার সঙ্গে তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ হয় State Monitoring Team দ্বারা।

সবশেষে পরীক্ষিত শিখন সামগ্রী বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর কাছে চূড়ান্ত পর্যালোচনা ও সম্পাদনার জন্য প্রদান করা হয়। এই পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয় ডায়েট, হুগলির তত্ত্বাবধানে ৬ ডিসেম্বর' ২০১৬ থেকে ১০ ডিসেম্বর' ২০১৬ পর্যন্ত।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশনাকালে প্রকল্পের পক্ষ থেকে যাঁদের ঋণ স্বীকার করে নিতে হয়, তাঁরা হলেন — শ্রী মিলন কুমার সাহা, অধ্যক্ষ, ডায়েট, দক্ষিণ দিনাজপুর, ড. স্বপ্না ঘোষ, অধ্যক্ষা, ডায়েট, উত্তর ২৪ পরগনা, শ্রী তপন কুমার মল্লিক, অধ্যক্ষ, ডায়েট, বর্ধমান, ড. সন্ধ্যা দাস বসু, অধ্যক্ষা, ডায়েট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং শ্রী পরিতোষ প্রামাণিক, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ডায়েট, পুরুলিয়া।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় — অধ্যক্ষ, ডায়েট হুগলি, ড. কে. এ. সাদাত ও অধ্যক্ষ, ডায়েট, হাওড়া, ড. বিশ্বরঞ্জন মান্নাকে — যাঁরা শিখন সামগ্রী প্রণয়ন ও পাইলট টেস্টিং এর মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়কে সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে এই প্রকল্পকে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী নীলাঞ্জন বালা, রিসার্চ ফেলো, এস. সি. ই. আর. টি-কে — এই প্রকল্প শুরু থেকেই যাঁর পরিকল্পনা, প্রচেষ্টা ও ভাবনায় একটি পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ে বিকশিত হয়ে আজ সার্থকতার পথে অগ্রসর হতে পেরেছে।।

এই পুস্তকটি রচনার ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন — ড. মোম মিত্র, ড. অভিজিৎ গোস্বামী, ড. প্রদীপ দাস ও সোমনাথ হাজরা।

ড. ছন্দা রায়
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

সূচীপত্র (Content)

প্রথম অধ্যায় :	শিক্ষার দার্শনিক ধারণা (Philosophical understanding of Education)	১
দ্বিতীয় অধ্যায় :	শিক্ষার উপাদান (Factors of Education)	১৩
তৃতীয় অধ্যায় :	শিখন, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষণ (Learning, Learner and Teaching)	২১
চতুর্থ অধ্যায় :	জ্ঞান এবং পাঠক্রম (Knowledge and Curriculum)	৩৫
পঞ্চম অধ্যায় :	মহান শিক্ষাবিদ্গণ (Great Educators)	৪৯
ষষ্ঠ অধ্যায় :	শিক্ষা, রাজনীতি ও সমাজ (Education Politics and Society)	৬৭
সপ্তম অধ্যায় :	ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো ও প্রক্রিয়া (Structure and Process of Indian Education System)	৭৪
অষ্টম অধ্যায় :	বিদ্যালয়ের কার্যকারিতা ও বিদ্যালয়ের মান (School Effectiveness and School Standards)	৮৬
নবম অধ্যায় :	বিদ্যালয় নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনা (School Leadership and Management)	১০৩
দশম অধ্যায় :	শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুযোগসুবিধার পরিবর্তন (Changed Facilitation In Education)	১১৪

অধ্যায় ১

শিক্ষার দার্শনিক ধারণা

(Philosophical understanding of Education)

১.১ সূচনা (Introduction)

দর্শন হল বিশ্ব সম্বন্ধে সামগ্রিক জ্ঞান। দার্শনিকদের মনে কতগুলি প্রশ্ন দেখা দিল। যেমন-জীবন কী? মানুষের উৎস কী? জীবনের উদ্দেশ্য কী? ইত্যাদি। এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গড়ে উঠল বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ।

আবার, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তার উন্নতিসাধন করা।

দর্শনের বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে দর্শনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি-জীবনে কোন্ মূল্যবোধ জাগানো দরকার, তা দর্শনই নির্ধারণ করে।

শিক্ষার দার্শনিক ধারণা গড়ে তোলার জন্য এই অধ্যায়ে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করব।

- মানব প্রকৃতি, সমাজ, শিখন এবং শিক্ষার লক্ষ্যের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ধারণার বোধ
  (Understanding the Basic Assumptions about Human Nature, Society, Learning and Aims of Education)
- বিদ্যালয় এবং শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক এবং মানবসমাজে শিক্ষার বিভিন্ন প্রক্রিয়াসমূহের ব্যাখ্যা
  (Relationship between Schooling and Education and exploring various educative process in Human Societies)

১.২ মানব প্রকৃতি, সমাজ, শিখন এবং শিক্ষার লক্ষ্যের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ধারণাগুলি (Understanding the basic assumptions about human nature, society, learning and aims of education)

উদ্দেশ্য : ১. মানব প্রকৃতি, সমাজের সম্পর্ক ও বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলা।

২. মানব প্রকৃতি ও সমাজের পরিবর্তনের জন্য শিখন এবং শিক্ষার লক্ষ্য কীভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা বোঝা।

- মানব প্রকৃতির মৌলিক ধারণা :
  প্রকৃতিগতভাবে মানুষকে দুই দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায় —
  ১. অধিবিদ্যা বা Metaphysics
  ২. বিজ্ঞান বা Science

অধিবিদ্যাগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মানুষ দুটি উপাদানের সমষ্টি।

১. দেহ অর্থাৎ অস্থিমজ্জা
২. মন অর্থাৎ আত্মা।

একে আমরা দ্বৈতবাদ বলি।

আবার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মানুষ হল একধরনের বস্তু। কিন্তু সাধারণ বস্তুর থেকে মানুষ একটু আলাদা। বস্তুর মতো মানুষ স্থান অধিকার করে ঠিকই কিন্তু তার নিজস্ব গতিশীলতা আছে। এই স্বতঃ চলনের জন্য মানুষ অনেক বেশি বাস্তব।

মানুষ তার আত্ম-সক্রিয়তার ফলে নিজের উদ্দেশ্য স্থির করতে পারে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, কাজকর্মে প্রবৃত্ত হতে পারে এবং আত্মপ্রত্যয় জাগলে নিজের দায়িত্ব নিজে সম্পাদন করতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে মন ও আত্মা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রেণি হিসাবে বস্তু ও মনের পার্থক্য থাকায় মনকে বস্তু বলা যায় না কিন্তু এটি একটি সত্তা যার প্রকাশ ঘটে আমাদের সচেতনতা, প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, চিন্তা এবং অনুভূতির মধ্যে দিয়ে। এই মানবিক সত্তাই আমাদের আত্ম-সচেতনতার মূল ভিত্তি।

মানব প্রকৃতির দ্বৈতবাদ এবং শিক্ষার তাৎপর্যগত কারণে দু'ধরনের শিক্ষা-মনোবিদ্যার উৎপত্তি হয়েছে।

(ক) মানুষের মানসিক প্রক্রিয়াগুলির যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং

(খ) দৈহিক সঞ্চালনগত প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা।

মানব প্রকৃতির দ্বৈতবাদের তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক দিকের সমস্যাকে সমাধান করার জন্য শিক্ষা-দার্শনিকগণ এক ধরনের একত্ববাদের কথা বলেছেন। তাঁদের মতে মানব প্রকৃতি পুরোপুরিভাবে দেহ এবং মন নিয়ে গঠিত।

কোনো কোনো প্রকৃতিবাদী দার্শনিক মানসিক ক্রিয়াকলাপকে দৈহিক ক্রিয়াকলাপের রূপ দেওয়ার পক্ষপাতী।

আবার কোনো কোনো আদর্শবাদী দার্শনিক মানসিক ক্রিয়াকলাপকে বস্তুতে রূপ দিতে চান। বিশ্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে জানার কেন্দ্র হল মন — আদর্শবাদীদের এই ধারণাই একত্ববাদের উৎস।

- **মানব প্রকৃতির মৌলিক দিক —**

মানব প্রকৃতির অধিবিদ্যা (Metaphysical) ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে মানব প্রকৃতি দু'টি মৌলিক দিক নিয়ে গঠিত :

১. ক্ষমতা (Power)

২. গতিশীলতা (Mobility)

- **ক্ষমতা** — শিশুর ক্ষমতা বলতে বোঝায় যা মানব শিশুকে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যবিধান করতে এবং বিভিন্ন কাজে পারদর্শিতা অর্জন করতে সাহায্য করে।
- **গতিশীলতা** — শিশুর প্রকৃতি মূলত গতিশীল। শিশু কেবলমাত্র প্রত্যক্ষণ নয়, বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে।

মানব প্রকৃতির গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং স্বয়ংক্রিয়তার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি পরিণত হয়। একেই আত্মা বলে। আত্মা একক সত্তা হলেও এর বিভিন্নরকম স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। এর প্রধান দুটি ক্ষমতা হল দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা।

দৈহিক ক্ষমতার দ্বারা আত্মা সংবেদন গ্রহণ, অনুভূতি এবং ইচ্ছা ব্যক্ত করতে পারে।

মানসিক ক্ষমতা আত্মাকে স্মরণ, কল্পনা, কারণ নির্ণয় ইত্যাদিতে সক্ষম করে তোলে।

স্বাভাবিকভাবে মানব প্রকৃতিতে ক্ষমতার ক্রমবিন্যাস আছে। দৈহিক ক্রিয়াগুলি মানসিক ক্রিয়ার অধীন। মানব প্রকৃতির আধুনিক তত্ত্বে মৌলিক ক্ষমতাগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। মানুষের ক্রমবিবর্তন তত্ত্বের জৈবিক ব্যাখ্যা থেকে এই শ্রেণিগুলির উৎপত্তি। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে আত্মার শক্তির ক্রমবিবর্তনের ফলে মানুষের মধ্যে কতগুলি প্রবৃত্তি এবং আবেগ দেখা দেয়। এই প্রবৃত্তিগুলি পরিবর্তনযোগ্য। আবার অনেক প্রবৃত্তির সঙ্গে দৈহিক কাঠামো এবং দৈহিক প্রক্রিয়ার সম্পর্ক দেখা যায়। যেমন — ভয় পেলে গ্রন্থির নিঃসরণ বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলির পরিবর্তন ঘটে।

মানব প্রকৃতির ক্ষেত্রে দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলির তাৎপর্য হল, যে সমস্ত প্রেষণাগুলি মানুষের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে, শিক্ষা প্রক্রিয়ায় সেগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রে আছে শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীর প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষক শুরু থেকে অবহিত থাকলে পাঠক্রম প্রণয়ন সহজ হয় এবং সমগ্র শিক্ষা পদ্ধতিটি পরিচালনা করতে সুবিধে হয়।

- **মানব প্রকৃতির সামাজিক ভিত্তি :**

  অনেক দার্শনিক মনে করেন মানুষের প্রকৃতি হল তার সামাজিক আচরণের ভিত্তি। আর এই সামাজিক আচরণের ভিত্তি হল সামাজিক প্রবৃত্তি।

  মানব প্রকৃতির সামাজিক ভিত্তি প্রবৃত্তিজাত না অভ্যাসগত—এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

  মানব প্রকৃতির সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক প্রক্রিয়া ও ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মানব প্রকৃতির এই ধরনের সামাজিক ভিত্তি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রক্রিয়ার সূচনা করে।

- **শিক্ষার লক্ষ্য :**

  আধুনিককালে শিক্ষাবিজ্ঞানে ‘শিক্ষা’ শব্দটি যখন ব্যবহৃত হয়, তখন তার গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্যকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। যেকোনো ধরনের শিক্ষাব্যবস্থারই নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য থাকে। শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত তার লক্ষ্য স্থির করা। আর এই লক্ষ্য স্থির করার পূর্বে তার প্রয়োজনীয়তার দিকটির আলোচনা করা আবশ্যক।

  শিক্ষা হল একপ্রকার উদ্দেশ্যমুখী সচেতন প্রচেষ্টা যার দ্বারা ব্যক্তির আচরণধারার মধ্যে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়। তাই শিক্ষা প্রচেষ্টার শুরুতেই শিক্ষার্থীর আচরণ পরিবর্তনের নির্দিষ্ট মান বা লক্ষ্য স্থির করা প্রয়োজন। শিক্ষার লক্ষ্য স্থির না হলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই তাদের শিখনকালীন নিজ নিজ আচরণের তাৎপর্য খুঁজে পাবেন না। শুধু তাই নয়, পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ছাড়া শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত অগ্রগতি সঠিকভাবে পরিমাপ করাও সম্ভব নয়।

  ‘শিক্ষা’ শব্দের প্রকৃতি তার লক্ষ্যের মধ্যেই ব্যক্ত হয়। লক্ষ্য ছাড়া শিক্ষার ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে কোনো গুরুত্ব নেই। গতিময় ও পরিবর্তনশীল শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষার লক্ষ্যেরও অভিব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে তাই স্বাভাবিকভাবেই বৈচিত্র্যময়তা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বিশেষিত কিছু শিক্ষা-লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন— শিক্ষার বৃত্তিমূলক লক্ষ্য, কৃষ্টিমূলক লক্ষ্য, নৈতিক লক্ষ্য, আধ্যাত্মিক লক্ষ্য, অভিযোজনমূলক লক্ষ্য ইত্যাদি। আবার উদ্দেশ্যগত দিক থেকে শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা যায়।

শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করা প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদগণের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু স্থিরীকৃত লক্ষ্যের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন সেদিকে লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ।

  - শিক্ষা যেহেতু একটি বহমান প্রক্রিয়া তাই এটি পরিবর্তনশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।
  - শিক্ষার লক্ষ্য বহুমুখী ও বৈচিত্রপূর্ণ হওয়া উচিত।
  - শিক্ষা একপ্রকারের সামাজিক প্রক্রিয়া হওয়ায়, এর লক্ষ্য অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত।

- **শিখন :**

  শিখন হল এমন এক ধরনের বিকাশ প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তি নতুন আচরণ সম্পাদন করার দক্ষতা অর্জন করে। মনোবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিখনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। বার্নার্ড এর মতে, শিখন হল আচরণের পরিবর্তন। মনোবিদ ড্রিভার এর মতে, ফলাফলের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আচরণের পরিবর্তনকে শিখন বলে। মনোবিদ ক্রো এন্ড ক্রো বলেন, শিখন হল অভ্যাস, মনোভাব গঠন ও জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া। অধ্যাপক Bloom শিখনকে আবার জ্ঞানমূলক শিখন, অনুভূতিমূলক শিখন এবং সমস্যামূলক বা দক্ষতামূলক শিখন— তিনটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন।

শিখনের ক্ষেত্রে মানুষের সহজাত প্রকৃতি ও প্রকৃতির প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

- প্রতিটি শিক্ষার্থীর কিছু সহজাত প্রকৃতি থাকে। শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর যাতে অনুশীলনের মাধ্যমে সামাজিক ও জ্ঞানমূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, তা হবে শিখনের উদ্দেশ্য।
- মানব প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল স্বয়ংক্রিয়তা, শিখনে-এর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ।
- মানব প্রকৃতির যেসব প্রেষণা মানুষের আচরণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, শিক্ষা প্রক্রিয়ায় সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ।
- মানব প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হওয়া যা শিখনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন— যুথবদ্ধতা, কৌতূহল, খেলা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

(১) মানব প্রকৃতির মৌলিক ধারণা সম্বন্ধে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করুন।

(২) শিখনের উপর মানব প্রকৃতির প্রভাব আলোচনা করুন।

শিখনের ফল :

(১) শিক্ষার্থীরা মানব প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পাবে।

(২) শিখনের দ্বারা সমাজে কীভাবে পরিবর্তন আনা যায় তা বুঝতে পারবে।

১.৩ বিদ্যালয় এবং শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক এবং মানবসমাজে শিক্ষার বিভিন্ন প্রক্রিয়াসমূহের ব্যাখ্যা (Relationship between school and education and Explanations regarding various educational processes existing in human-society)

উদ্দেশ্য : (১) বিদ্যালয় ও শিক্ষার সম্পর্ক বুঝতে পারা।

(২) মানব সমাজে যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রক্রিয়া বর্তমান তা আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করতে পারা।

(৩) বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন সম্বন্ধে বুঝতে পারা।

বিষয়বস্তু :

বিদ্যালয় ও শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক : মানব জীবনযাত্রা জটিল হতে থাকায় এবং জীবনের সঙ্গে অভিযোজন করার জন্য পূর্বের অপ্রথাগত শিক্ষা যথেষ্ট নয়। তাই প্রয়োজন হল একাধিক বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি যাঁরা নির্দিষ্ট স্থানে শিশুদেরকে নিয়ে এসে অভিযোজনের কৌশল শেখাবেন এবং তা অনুশীলনের জন্য উৎসাহদান করবেন। তাই প্রয়োজন পড়ল একটি নির্দিষ্ট স্থানের যেখানে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ আছে। সেই স্থানের নামই হল বিদ্যালয়, যেখানে প্রথাগত শিক্ষা দেওয়া হয়। অতএব শিক্ষার সঙ্গে বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় জীবনের (Schooling) -এর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

শিক্ষার অন্য তিনটি উপাদান যথা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পাঠক্রম পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে আবদ্ধ। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্য একটি মাধ্যম প্রয়োজন, আর বিদ্যালয় এই মাধ্যমের কাজ করে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বিপুল ও জটিল আকার ধারণ করেছে। পরিবারের মধ্যে থেকে এই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। বিদ্যালয় এই দায়িত্ব গ্রহণ করে। শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ, এবং এই বিকাশকে সঠিক রূপ দেওয়া কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব। বিদ্যালয় অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য পূরণ করে। তা হল শিক্ষার্থীদের

জীবিকা অর্জনের জন্য প্রস্তুত করা। যার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করা, যা কেবল বিদ্যালয় পরিবেশেই সম্ভব। আমাদের দেশে শিক্ষা হল সকলের জন্য। যেসব শিশুরা পিছিয়ে আছে, তাদের জন্যে বিশেষ শিক্ষার আয়োজন একমাত্র বিদ্যালয়ের পক্ষেই করা সম্ভব।

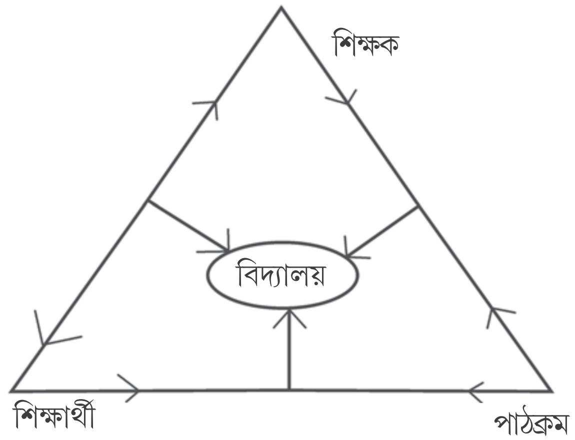

মানবসমাজে শিক্ষার বিভিন্ন প্রক্রিয়াসমূহ

বিভিন্ন শিক্ষার প্রক্রিয়া

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা [Informal Education]	প্রথাবহির্ভূত [Non-Formal]	নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা [Formal Education]

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা (Informal Education)

বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের বাইরে কোনো রীতিনীতি বা অনুষ্ঠান ছাড়াই যে ধরনের শিক্ষালাভ করে শিক্ষার্থীরা তাকেই অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বলা হয়। কুম্বস্ (Coombs)-এর মতে "Informal education is that type of education, which takes place all the time informally or incidentally." অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা হল এমনই এক শিক্ষা যা সর্বদা নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে ঘটে।

বৈশিষ্ট্য :

(ক) যে শিক্ষা সবসময় চলছে, যার উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

(খ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া শিশু যখন অন্যান্য মাধ্যম থেকে শিক্ষা অর্জন করে।

(গ) পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে গিয়ে পরিবেশ থেকে যখন কেউ দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাই হল অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।

(ঘ) এই শিক্ষায় নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষক নিযুক্ত থাকেন না। যেমন গণশিক্ষার মাধ্যমগুলি — বেতার, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, সংবাদপত্র ইত্যাদি।

(ঙ) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত কারণ এখানে শিক্ষার্থীদের জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পড়ানো হয় না। তারা স্বাভাবিক উপায়ে বিভিন্ন উৎসের মাধ্যম থেকে শিক্ষালাভ করে।

(চ) যার ফলে এই ধরনের শিক্ষায় কোনো বিষয়বস্তু বা পাঠক্রমের উপস্থিতি নেই।

(ছ) এখানে কোনো কিছুই আগে পরিকল্পিত বা নির্ধারিত থাকে না। যেহেতু এখানে বিদ্যালয়, পাঠক্রম ও নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই তাই আগে থেকে পরিকল্পনা করার মতো কিছু নেই।

(জ) এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী নিজেই বাড়ির বা বাইরের পরিবেশের কোনো উপাদানকে পর্যবেক্ষণ করে, তা অনুশীলনের মাধ্যমে নিজে নিজেই শেখে।

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার কয়েকটি মাধ্যম :

পরিবার : পরিবার হল এমন একটি সামাজিক একক যার সদস্যদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক বর্তমান। ব্যালার্ড (Ballard) -এর মতে, পরিবার সমাজের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার থেকে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে।

পরিবারের কার্যাবলি

- **সাধারণ কার্যাবলি**
  - দৈহিক নিরাপত্তাদান
  - জৈবিক চাহিদা নিবারণ
  - সামাজিকীকরণে সহায়তা
  - উৎপাদনশীল ক্রিয়ায় সহায়তা
  - সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও বণ্টন
  - অন্তরঙ্গতা বজায় রাখা
- **শিক্ষামূলক কার্যাবলি**
  - সামাজিক আচরণের শিক্ষা
  - সংস্কৃতির শিক্ষা
  - সু-অভ্যাস গঠনের শিক্ষা
  - প্রাক্ষোভিক বিকাশের শিক্ষা
  - জ্ঞানার্জনের শিক্ষা
  - ঐতিহ্য সংরক্ষণের শিক্ষা
  - বৃত্তি শিক্ষা
  - আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা
  - মূল্যবোধের শিক্ষা

পরিবারের সীমাবদ্ধতা

- পরিবারের আকার হ্রাস
- সমান্তরাল প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব
- সময়ের উপযোগী চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা
- নিরক্ষরতাজনিত সমস্যা
- শিক্ষার বহুমুখীতা
- নিরাপত্তাজনিত সমস্যা

সংবাদপত্র : গণসংযোগের প্রাচীনতম মাধ্যম হল সংবাদপত্র। প্রাত্যহিক ঘটনাবলি প্রকাশ করা ছাড়াও, জনমত গঠনে, নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টিতে, ব্যক্তির চিন্তাশক্তির বিকাশে, শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

সংবাদপত্রের ভূমিকা

ভূমিকা

- সংবাদ পরিবেশন
- সামাজিক চেতনার জাগরণ
- জনমত গঠন
- ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি
- সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন
- দেশ বিদেশের তথ্য সরবরাহ
- কম খরচে সংবাদ প্রদান
- মানসিক বিকাশে সাহায্য করে
- শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি

সীমাবদ্ধতা

- অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন
- পীত সাংবাদিকতা
- ব্যক্তি ও শিশুমনে কু-প্রভাব
- নিরক্ষরদের শিক্ষাদানে অক্ষমতা
- শিশু ও অন্ধদের কাছে আকর্ষণহীন

বেতার : গণশিক্ষার একটি শ্রুতিধর্মী মাধ্যম, সংবাদপত্রের থেকেও অধিক চিত্তাকর্ষক। বিশেষ করে নিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছে।

বেতারের ভূমিকা

ভূমিকা

- সর্বজনগ্রাহ্য অনুষ্ঠান প্রচার
- স্বল্প খরচ
- সব বয়সের চিত্ত বিনোদন সহায়তা
- সমাজচেতনার জাগরণ ঘটায়
- সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটায়
- দৃষ্টিহীনদের সহায়ক
- সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে অনুষ্ঠান পরিবেশন

সীমাবদ্ধতা

- শ্রুতিনির্ভরতা
- পরিকল্পিত শিখন কৌশল ব্যবহারে অসুবিধা
- শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের পরিমাণ কম

দূরদর্শন : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এক আশ্চর্য অবদান।

দূরদর্শনের ভূমিকা

ভূমিকা

- বাস্তবধর্মী শিক্ষাদান
- সার্বজনীন গণমাধ্যম
- দর্শন ও শ্রবণনির্ভর মাধ্যম
- নান্দনিক রুচি বিকাশে সহায়ক
- সংস্কৃতির ধারক ও বাহক
- জনমত গঠন
- মানসিক বিকাশে সহায়তা করে

সীমাবদ্ধতা

- বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের প্রাধান্য
- ব্যয়বাহুল্য
- বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল
- শিশুদের উপর বিরূপ প্রভাব

চলচ্চিত্র : এটি একটি আধুনিক যুগের জনপ্রিয় গণমাধ্যম। উন্নত দেশগুলির শিক্ষা সহায়ক উপকরণ হিসেবেও চলচ্চিত্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

চলচ্চিত্রের ভূমিকা

ভূমিকা
- বাস্তবধর্মী তথ্য পরিবেশন
- জ্ঞানবৃদ্ধিতে সহায়ক
- সামাজিক চেতনা বিকাশে সহায়তা
- মানবিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব প্রদান
- মানসিক বিকাশে সহায়তা করে
- গ্রহণযোগ্যতা
- চিত্তবিনোদন
- ব্যক্তির চাহিদা পূরণে সহায়তা করে

সীমাবদ্ধতা
- কু-প্রভাব
- কু-অভ্যাস গঠন
- ভ্রান্ত ধারণা গঠন
- সময়ের অপচয়
- ব্যয়বহুল
- একমুখী সংযোগ

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা (Formal Education)

সমাজজীবনের জটিলতা বৃদ্ধির কারণে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হলে মানুষ বুঝতে পারে যে প্রশিক্ষণ ছাড়া ওই সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ফলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়।

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা

বৈশিষ্ট্য
- নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী পরিকল্পিত
- নির্দিষ্ট সূচি দ্বারা সীমাবদ্ধ
- নির্দিষ্ট পাঠক্রম
- যোগ্য শিক্ষক দ্বারা উপস্থাপন
- কঠোর শৃঙ্খলা
- নির্দিষ্ট বয়সের শিক্ষার্থী
- নির্দিষ্ট স্থান
- নিয়মিত উপস্থিতি
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক
- নিয়মিত পরীক্ষা
- রাষ্ট্রের ভূমিকা

সীমাবদ্ধতা
- যান্ত্রিক ও কৃত্রিম
- সুযোগসুবিধার অভাব
- শিক্ষক নির্ভর
- বৈচিত্র্যহীনতা
- অপরিবর্তনশীলতা
- নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক
- পরীক্ষা কেন্দ্রিকতা
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কে অবনতি
- সীমিত প্রবেশ পথ

বিদ্যালয় : আধুনিক সমাজব্যবস্থায় বিদ্যালয় হল নিয়ন্ত্রিত বা প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাস্তবে এটি এমন এক প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা এক নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হন এবং নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কোনো পাঠক্রম অনুশীলনে সহায়তা করেন।

বিদ্যালয়ের দায়িত্ব

- **শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক দায়িত্ব**
  - বৌদ্ধিক বিকাশ
  - ব্যক্তিসত্তার বিকাশ
  - বৃত্তিমূলক নির্দেশনা
  - শিক্ষামূলক নির্দেশনা
  - মূল্যায়ন
- **সমাজকেন্দ্রিক দায়িত্ব**
  - সামাজিকীকরণ
  - ঐতিহ্যের সংরক্ষণ
  - সঞ্চালন ও উন্নয়ন
  - গণতান্ত্রিক বোধের বিকাশ
  - পরিবার, বিদ্যালয় ও কমিউনিটির সম্পর্ক

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা (Non- Formal Education)

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনব্যাপী শিক্ষার লক্ষ্যপূরণে নিয়ন্ত্রিত এবং অনিয়ন্ত্রিত উভয় প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থারই ত্রুটিবিচ্যুতি বেশ কিছুকাল ধরেই প্রকাশ পাচ্ছিল। তখনই প্রায় গঠিত হয় অনিয়ন্ত্রিত ও নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মাঝামাঝি পর্যায়ে এক শিক্ষাব্যবস্থা যা অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মতো সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত নয়, আবার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মতো বাঁধাধরা নিয়মে আবদ্ধও নয়। এই শিক্ষাই হল প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা বা নিয়মবহির্ভূত শিক্ষা। এই শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটায়।

এই শিক্ষা কোনো প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না থেকেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আংশিক নিয়ন্ত্রণে থাকে। এটি শিক্ষা প্রক্রিয়ার বাইরে সংগঠিত কোনো শিক্ষার প্রশিক্ষণ যার ফলে শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষমতা বাড়ে ও শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটে।

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা

- **বৈশিষ্ট্য**
  - প্রাসঙ্গিকতা
  - নমনীয়তা
  - ব্যবহারিকতা
  - বিদ্যালয়ছুট শিক্ষার্থীদের জন্য পুনরায় শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ
  - নির্দিষ্ট সময়সীমার অনুপস্থিতি
  - নির্দিষ্ট বয়সসীমার অনুপস্থিতি
  - নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষালয়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়
  - কম খরচে শিক্ষা
  - পাঠক্রম নির্বাচনে স্বাধীনতা
  - মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নমনীয়
  - জীবনব্যাপী জ্ঞানলাভের সুযোগ
- **সীমাবদ্ধতা**
  - সব ধরনের চাহিদাপূরণে ব্যর্থতা
  - সামাজিক বিকাশের সুযোগের অভাব
  - পাঠক্রম ও শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্টতার অভাব
  - পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব
  - প্রথাগত শিক্ষার দ্বারা অর্জিত শংসাপত্রের গুরুত্ব প্রথাবহির্ভূত অর্জিত শংসাপত্রের তুলনায় বেশি ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

শূন্যস্থান পূর্ণ করো :—

(১) শিক্ষা প্রক্রিয়া ______ ভাগে বিভক্ত।

(২) প্রথাগত শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রধান প্রতিষ্ঠান হল ______

(৩) প্রথাগত শিক্ষা প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা হল —

(ক) শিক্ষায় সুযোগের অভাব

(খ) শিক্ষকনির্ভরতা

(গ) পরীক্ষাকেন্দ্রিকতা

(ঘ) উপরের সবগুলি।

(৪) ছবিটি শেষ করুন।

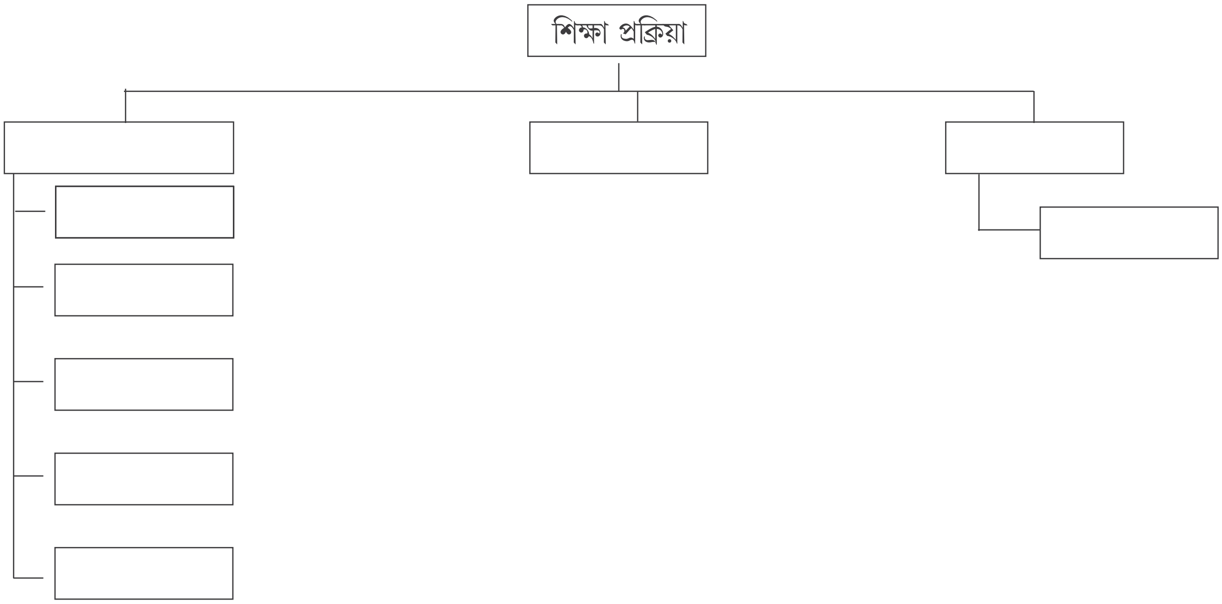

শিখনের ফলাফল :

(১) শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন।

(২) শিক্ষার্থীরা মানব সমাজে বিভিন্ন রকমের শিক্ষার প্রক্রিয়াগুলি আবিষ্কার করতে পারবেন।

(৩) বিভিন্ন শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে তফাত করতে পারবেন।

১.৪ সারাংশ (Summary) :

- মানব প্রকৃতির মৌলিক ধারণা দুভাগে বিভক্ত করা হয়। ১) অধিবিদ্যা বা Metaphysics ২) বিজ্ঞান বা Science
- শিক্ষকের শিক্ষার্থীর প্রকৃতি সম্বন্ধে জানা থাকলে পাঠক্রম প্রণয়ন ও সমস্ত শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালনা করতে সুবিধা হয়।
- শিক্ষার্থী ও শিক্ষক দুজনেরই ক্ষমতা, ক্ষমতার শ্রেণি, স্বয়ংক্রিয়তা, প্রবৃত্তি শিখনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।
- শিক্ষার তিনটি উপাদান শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও পাঠক্রমের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্যে একটি মাধ্যম দরকার পড়ে। বিদ্যালয় সেই মাধ্যমের কাজ করে।
- বিদ্যালয় ও শিক্ষার অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক, তার কারণ শিক্ষার লক্ষ্যগুলি যেমন শিক্ষার্থীদের জীবিকা অর্জনের জন্য প্রস্তুত করা, শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ এবং সকলের জন্য শিক্ষা, এই সবই সম্ভব হয় বিদ্যালয়ানের জন্য।
- মানবসমাজে শিক্ষার বিভিন্ন প্রক্রিয়া কাজ করে যেমন — অনিয়ন্ত্রিত, নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মবহির্ভূত শিক্ষা।
- অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা হল এমন ধরনের শিক্ষা যার উপর আমাদের কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ নেই, এবং যা সবসময় চলছে। এর মধ্যে আসে পরিবার, বেতার, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, সংবাদপত্র ইত্যাদি।
- নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার উদাহরণ হল বিদ্যালয়। এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পাঠক্রম ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ সবই নিয়ন্ত্রিত। এই ধরনের শিক্ষা দু-ধরনের শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে থাকে যথা — শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক দায়িত্ব ও সমাজকেন্দ্রিক দায়িত্ব।
- নিয়মবহির্ভূত শিক্ষায় শিক্ষা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত নয় আবার বাঁধাধরা নিয়মে আবদ্ধ নয়। এই শিক্ষা চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না থেকেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আংশিক নিয়ন্ত্রণে থাকে।

১.৫ অনুশীলনী (Exercise) :

সঠিক উত্তরটি (✓) চিহ্ন দিন :

(১) প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হল —

(ক) শিক্ষালয় চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ নয়।

(খ) পাঠক্রম নির্বাচনে স্বাধীনতা

(গ) জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ

(ঘ) উপরের সবগুলি।

(২) প্রথাগত শিক্ষার সীমাবদ্ধতা হল —

(ক) শিক্ষায় সুযোগের অভাব

(খ) শিক্ষক নির্ভরতা

(গ) পরীক্ষাকেন্দ্রিকতা

(ঘ) উপরের সবগুলি।

(৩) প্রথাগত শিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠান হল —

(ক) পরিবার

(খ) ধর্মস্থান

(গ) সান্ধ্যক্লাব

(ঘ) বিদ্যালয়

(৪) গণমাধ্যম কাকে বলে? শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যমগুলি কী কী?

(৫) মানব প্রকৃতির সামাজিক ভিত্তি আলোচনা করুন?

(৬) মনুষ্য প্রকৃতির মৌলিক দিকগুলি কী কী?

১.৬ তথ্য উৎস (Reference)

(১) Modern Introduction to education — Dr. Dibakar Kundu — Sarada Book House

(২) Philosophical and Sociological Foundation of Education — N.R. Swaroop Saxena — R. Lall Book Depot.

(৩) Philosophical and Sociological Foundations of Education — Dr. Sharma and Laxmi Narayan Agarwal.

(৪) Theory and Principles of Education — J.C. Aggarwal — Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

(৫) Philosophical and Sociological Foundation of Education — M.H. Siddiqui.

(৬) The Philosophical and Sociological Foundation of Education — Bhatia and Bhatia – Asia Publishing House.

অধ্যায় ২

শিক্ষার উপাদান

(Factors of Education)

২.১ সূচনা (Introduction)

যে কোনো মানুষ তার নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যোগফল হিসাবে একটি পূর্ণ রূপ পায়। ঠিক তেমনি শিক্ষারও সঠিকভাবে পরিচালিত হবার জন্য কতকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, যার সাহায্যে শিক্ষার অস্তিত্ব বোঝা যায় এবং এই শিক্ষা প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করার জন্য কয়েকটি উপকরণের বা উপাদানের প্রয়োজন। শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া যার পরিধি খুব ব্যাপক। শুধু তাই নয় আজকের দিনে শিক্ষা শুধু প্রতিষ্ঠান নির্ভর নয়, এবং এর ব্যাপকতা প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়ে নানা ক্ষেত্রে, যার জন্য এই উপাদানগুলির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর কোনো স্থান ছিল না। সমস্ত শিশুকে বয়স্কদের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে মনে করা হতো। কিন্তু বিশ্বায়নের এই যুগে মানুষ অনেক বেশি যুক্তিনির্ভর হয়েছে এবং তার জীবন-চর্চায় যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞানমনস্কতা। তাই মানুষ আর আটকে নেই তার গৃহের, দেশের বা জাতির গণ্ডিতে। তাই শিক্ষা আজ কোনো নীরস এবং জীবন বিযুক্ত প্রক্রিয়া নয় বরং এমনটি মনে করা হয় যে শিশুকে না জানলে শিক্ষার সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে থাকে। তাই আধুনিক শিক্ষায় প্রাধান্য দেওয়া হয় শিশুর উপর।

উদ্দেশ্য : (১) শিক্ষার্থীরা শিক্ষার উপাদানগুলি কী কী জানতে পারবে।
(২) শিক্ষার উপাদানগুলির ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবে।
(৩) শিক্ষার উপাদানগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।
(৪) শিক্ষার উপাদানগুলির পরস্পরের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবে।

২.২ শিক্ষার উপাদান-শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পাঠক্রম, বিদ্যালয় (Factors of Education - Teacher, Learner, Curriculum, School)

বিষয়বস্তু : আমরা সবাই জানি যে শিক্ষা কখনও থেমে থাকে না। আমরা বিদ্যালয়ে পড়ি বা বাড়িতে থাকি, কোনো না কোনোভাবে আমরা জেনে বা আমাদের অজান্তে আমরা পছন্দ করি বা না করি কিছু না কিছু আমরা সবসময় শিখে যাচ্ছি।

তার মানে এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভালোভাবে বুঝতে গেলে তার অন্তর্গত উপাদানগুলো এবং তাদের ভূমিকা জানা খুব দরকার। সময়ের সঙ্গে মানুষের সঞ্চিত জ্ঞানের বৃদ্ধির ফলে শিক্ষাব্যবস্থা এখন অনেক নিয়ন্ত্রিত। তাই বর্তমানে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার প্রধান চারটি উপাদান হল —

(ক) শিক্ষার্থী বা শিশু

(খ) শিক্ষাদাতা বা শিক্ষক

(গ) শিক্ষার বিষয়বস্তু বা পাঠক্রম

(ঘ) শিক্ষার পরিবেশ বা বিদ্যালয়।

(ক) শিক্ষার্থী বা শিশু :

যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান উপাদান হল শিশু, কারণ এদের যদি অস্তিত্বই না থাকে তাহলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। শিশু বা শিক্ষার্থী এমন একটি সক্রিয় ও সজীব উপাদান যে এটি আছে বলেই যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থা একটি গতিময় রূপ পায়। তার কারণ শিক্ষা শিশুর চাহিদার উপর নির্ভর করে, সময়ের সঙ্গে এই চাহিদার পরিবর্তন ঘটে, তাই শিক্ষাব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। তার উপর যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে শিশু বা শিক্ষার্থী, শিশুদের অফুরন্ত সম্ভাবনা, প্রাণশক্তি, আবেগ, কল্পনা ইত্যাদি এই শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। তাই বলা যেতে পারে যে বাস্তবে শিক্ষার্থী ছাড়া শিক্ষার অন্যান্য উপাদানগুলি কখনো পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

(খ) শিক্ষাদাতা বা শিক্ষক :

শিক্ষককে যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থার দ্বিতীয় উপাদান হিসেবে ধরে নেওয়া হয় কারণ তারাই হল এই শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক। শিক্ষক ছাড়া শিক্ষা প্রক্রিয়া কখনোই সম্পাদিত হতে পারে না। পরিবার একটি সীমিত জায়গা পর্যন্ত শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে, কিন্তু পরবর্তীকালে এর গুরুভার শিক্ষককে পালন করতে হয়। তিনিই শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহলকে নিবৃত্ত করেন। অসহায় ও অপরিণত শিশুকে সমাজের উপযোগী করে তোলেন। জীবনে চলার পথে শিক্ষকই হলেন পথ-প্রদর্শক, জীবন দর্শনের প্রতীক ও বন্ধু, শিক্ষক শিক্ষার্থীকে অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোতে নিয়ে আসেন। দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে সাহায্য করেন এবং ভ্রান্ত পথ থেকে বিরত রাখেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পরিবর্তনশীল যুগের সাথে মানিয়ে চলতে সাহায্য করেন এবং অভিযোজনে সক্ষম করে তোলেন। শুধু তাই নয় জীবনে চলার পথে বিভিন্ন রকম নির্দেশনা দিতেও সাহায্য করে থাকেন শিক্ষক। শিক্ষার্থীর শিক্ষায় তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। যার ফলে শিক্ষক হলেন শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

(গ) পাঠক্রম :

শিক্ষা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া আর এর উদ্দেশ্যও যুগের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। পাঠক্রমের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়তা করা। শিশুর বহুমুখী বিকাশের জন্য বহুমুখী অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে, পাঠাগারে, পরীক্ষাগারে, খেলার মাঠে এমনকি শিক্ষকদের সঙ্গে দৈনন্দিন মেলামেশার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে, তারই সমন্বয় হল পাঠক্রম। অর্থাৎ একথা বলতে পারি যে পাঠক্রম হল ব্যক্তিজীবনে সর্বাঙ্গীন বিকাশ উপযোগী সুনির্বাচিত অভিজ্ঞতাসমূহের সমন্বয়।

(ঘ) শিক্ষার পরিবেশ বা বিদ্যালয় :

শিক্ষার কাজ তখনই সার্থকভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে যখন একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকবে এবং এই স্থানটির পরিবেশ ও আদর্শ শিক্ষাদানের সহায়ক হতে হবে। যেটি একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই প্রদান করা সম্ভব। যেখানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হবে। খেলার মাঠ ছাড়া খেলোয়াড়, মঞ্চ ছাড়া শিল্পী এবং জল ছাড়া সাঁতারু যেমন তৈরি হতে পারে না। তেমনি বিদ্যালয় ছাড়া শিক্ষার্থী কখনও পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে তৈরি হতে পারে না। তাই বিদ্যালয়কে শিক্ষার বাস্তব রূপায়ণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া শিশুর শিক্ষাপ্রদানের ক্ষেত্রে পরিবারের সীমিত ক্ষমতার জন্যই বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাই শিক্ষাপ্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও পাঠক্রম যেমন প্রয়োজন তেমনি আবার বিদ্যালয়েরও প্রয়োজন আছে।

শিক্ষার উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক :

শিক্ষার এই উপাদানগুলি যথা শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পাঠক্রম ও বিদ্যালয় কোনোটাই কিন্তু নিরপেক্ষ সত্তা নয় বা আলাদা দ্বীপের মতো অবস্থান করে না। শিক্ষার উপাদানগুলির মধ্যে প্রতিনিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে যা শিক্ষা প্রক্রিয়াকে একটি সার্থক রূপদান করে থাকে। এদের মিলিত পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর শিক্ষার কার্যকারিতা নির্ভর করে। শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে যে ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় তা হল — শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের, শিক্ষার্থীর সঙ্গে পাঠক্রমের এবং শিক্ষকের সঙ্গে পাঠক্রমের এই তিনরকম পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসাবে শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারিত হয়।

নিজ অগ্রগতি যাচাই

কীভাবে শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারিত তা দেখাও :

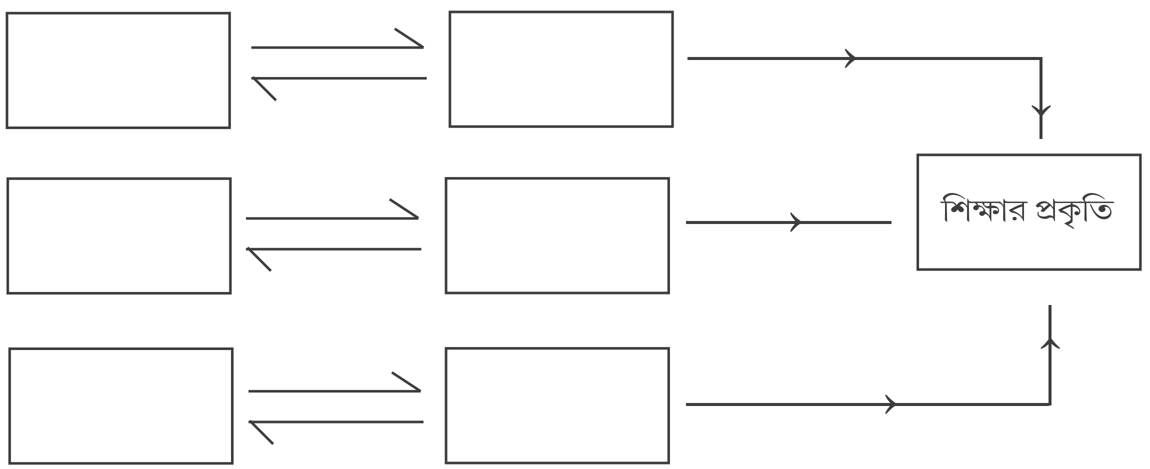

উপরের খালি চৌকোগুলি ভর্তি কর।

২) গুরুত্ব অনুযায়ী ক্রমানুসারে সাজাও-

বিদ্যালয় শিক্ষক

শিক্ষার্থী

পাঠক্রম

শিখনের ফলাফল :

(১) শিক্ষার উপাদানগুলি সম্পর্কে নির্দিষ্ট জ্ঞান।

(২) শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা।

(৩) শিক্ষার উপাদানগুলির ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

(৪) শিক্ষার উপাদানগুলির মিথস্ক্রিয়ার ফল পাওয়া।

২.৩ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা এবং তার গুরুত্ব (Child centric education and its importance)

উদ্দেশ্য :

(১) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা কী সেটি বুঝতে পারা।

(২) সাধারণ শিক্ষা এবং শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে তফাত করতে পারা।

(৩) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞান ও তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে পারা।

বিষয়বস্তু :

জ্যাঁ জ্যাক রুশো (Jean Jacques Rousseau) ছিলেন প্রথম চিন্তাবিদ্ যিনি বলেছিলেন যে শিক্ষক বা পাঠক্রম নয়, যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুকেই বা শিক্ষার্থীকেই যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে হবে। তিনি বলেছিলেন যে প্রাকৃতিক নিয়মে সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা রচিত হবে। অর্থাৎ শিক্ষা পরিচালিত হবে প্রাকৃতিক পরিবেশে, স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুসরণ করে, শিশুর নিজস্ব চাহিদা ও প্রবণতাগুলিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে শিক্ষা পরিচালনা করতে হবে।

ফরাসি চিন্তাবিদ রুশোর এই চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগিয়ে, শিশু শিক্ষাক্ষেত্রে পরিপূর্ণ স্বীকৃতি পেল। একেই বলা হয় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা। এবং যেহেতু রুশো এই চিন্তাভাবনার প্রবর্তক তাই জ্যাঁ জ্যাক রুশোকে শিক্ষা বিজ্ঞানের জনক হিসাবে ধরে নেওয়া হয়।

শিশুকেন্দ্রিকতা বলতে কোনো লক্ষ্য বা পদ্ধতিকে বোঝায় না, বরং এটি একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রবণতা। এই প্রবণতাই আধুনিক শিক্ষাকে গতিশীল করে তুলেছে।

সাধারণ শিক্ষা ও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা :

প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই যে সে যুগের শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও পরিচালনার রীতি ছিল অন্যরকম। সেই সময় শিক্ষার্থীকে কোনোরকম গুরুত্বই দেওয়া হতো না, এবং শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণভাবে শিক্ষককেন্দ্রিক, অনেক সময় শিক্ষার্থীকে শাস্তি দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখা হতো, এবং শিক্ষক তার নিজের ইচ্ছামতো শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু নির্বাচন করতেন। সেই বিষয়বস্তুর জ্ঞান শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে লাগুক কিংবা না লাগুক, তাই তাকে শিখতে হবে, এটাই ছিল তখনকার শিক্ষাব্যবস্থার রীতি। অতএব বলা যেতে পারে যে শিক্ষা ছিল সে সময় শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহান চিন্তা নায়ক রুশো প্রথম এই প্রচলিত শিক্ষা ধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষা বা পাঠক্রম নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুকেই যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে হবে। শিক্ষা শিক্ষকদের ইচ্ছায় বা পাঠক্রমের চাহিদায় পরিচালিত হবে না। শিশুর সাধারণ এবং স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দেবার কথা বলা হয়। বর্তমানে আমরা যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন দেখতে পাই তা এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, সাংগঠনিক রূপ সবই শিশুর সার্বিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে স্থির করা হয়, একেই বলা হয় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য :

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হল বিকাশমান শিক্ষার্থী, একটি মানুষকে তার জীবনে নানা স্তর উত্তীর্ণ হতে হয় — শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য। প্রত্যেকটি স্তর নিয়ে আসে শারীরিক, মানসিক নানা চাহিদা, রুচি ও আগ্রহ। প্রত্যেক মানুষের প্রবণতা, শারীরিক এবং বৌদ্ধিক সামর্থ্যও বিভিন্ন। এই ব্যক্তি বৈষম্যও খুব স্বাভাবিক। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, পদ্ধতিতে মূল্যায়নে, শিক্ষকদের ভূমিকায়, বিদ্যালয়ের জীবনে এবং বিভিন্ন কাজকর্মে প্রধানভাবে গৃহীত হয়েছে শিশুর জীবন, বিভিন্ন চাহিদা, রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা ও সামর্থ্য। তাই আধুনিক শিক্ষার অর্থ হল — জীবনই শিক্ষা, জীবন-অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ও পুনঃসৃজনই শিক্ষা। প্রকৃত মানুষ তৈরি করাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য।

বৈশিষ্ট্য :

১. **শিক্ষার ধারণা :** শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা হল জীবনব্যাপী। শিক্ষা হল মানুষের দ্বিতীয় জন্ম। একটি ব্যক্তি প্রথমে জন্মায় প্রকৃতির কোলে, তার দ্বিতীয় জন্ম হয় তার ভাবনার সাম্রাজ্যে মননের সাহায্যে মানুষ বিকাশ লাভ করে ও সমাজের ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সঞ্চালন করে সামাজিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া।

২. **শিক্ষার লক্ষ্য :** এখানে শিক্ষার লক্ষ্যের দুটো দিক আছে। একদিকে আছে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ আর অন্যদিকে থাকবে সমাজের বিকাশ। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হবে এই দ্বিমুখী সত্তার সমন্বয়। শিক্ষার আর একটি লক্ষ্য হল মানবসম্পদ পরিকল্পনা যা বর্তমান প্রযুক্তি-নির্ভর যুগের প্রধানতম লক্ষ্য। অর্থাৎ শুধুমাত্র অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলির বিকাশসাধনের উপর গুরুত্ব দিলেই হবে না, সমাজে সুষ্ঠুভাবে বসবাস করাই হলো শিক্ষার লক্ষ্য।

৩. **পাঠক্রম :** শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠক্রম কখনই পুঁথিগত হবে না, বরং বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে বিষয়বস্তুগুলি নির্বাচিত করতে হবে। তার সঙ্গে শিশুর যে স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সক্রিয়তাকে প্রাধান্য দিতে হবে যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ সম্পাদন করে নিজেদের আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এইসব কথা মাথায় রেখে পাঠক্রমের বিষয়বস্তুগুলি নির্বাচন করতে হবে।

৪. **খেলাভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি :** এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিখন পদ্ধতিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার কারণ সব শিশুকে একই রকমভাবে বা ধাঁচে শিক্ষা দেওয়া হবে না। তাদেরকে অনেক বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করার সুবিধে করে দিতে হবে, যাতে তাদের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সুবিধা হয়। তাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার পদ্ধতি হবে ব্যক্তিনির্ভর এবং খেলাভিত্তিক।

৫. **শিক্ষক :** এই ধরনের পদ্ধতিতে শিক্ষক নিজের ইচ্ছামতো পড়াতে পারবেন না। শিক্ষককে শিশুর বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শকের কাজ করতে হবে। শিক্ষককে অভিভাবকের বিকল্প হয়ে কাজ করতে হবে। শিক্ষককে শুধুমাত্র জ্ঞান প্রদান করলে চলবে না তাঁকে শিশুর সহায়ক হয়ে কাজ করতে হবে এবং তার শিক্ষার পরিবেশের আদর্শ সংগঠক ও রূপকার হতে হবে।

৬. **শৃঙ্খলা :** শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় যে ধরনের শৃঙ্খলা মেনে চলা হয় সেটি হল মুক্ত শৃঙ্খলা বা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা। শিশু এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় স্বেচ্ছায় আন্তরিকভাবে শৃঙ্খলিত হবার তাগিদ অনুভব করবে এবং সে নিজেই নিজেকে শৃঙ্খলিত করবে। সকল রকমের বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ থেকে শিশুকে সবসময় মুক্ত রাখতে হবে। কোনোভাবেই যেন শৃঙ্খলা শাসন বা দমনের রূপ না নেয়, কারণ তা হলেই শিশুর আত্মবিকাশের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

৭. **মানবীয় সম্পর্ক :** শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যেন একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে যেটা না হলে শিশুকেন্দ্রিকতা কোনোদিনই রূপায়িত হতে পারবে না, আর গতানুগতিক শিক্ষার সঙ্গে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

৮. **বিদ্যালয় :** শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয় হবে সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। একে ফলপ্রসূ করতে গেলে সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিদ্যালয় জীবনের মধ্যে প্রবিষ্ট করাতে হবে। যাতে কোনোরকমভাবেই সমাজ জীবনের সাথে বিদ্যালয়ের জীবনে পার্থক্য না থাকে।

৯. **সক্রিয়তা :** শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা সক্রিয়তা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি ছাড়া কোনো শিক্ষাই সক্রিয় রূপ নিতে পারে না। তার কারণ সক্রিয়তা হল শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম, তাই একে বিসর্জন দিয়ে কোনো শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। চঞ্চলতা বা সক্রিয়তার মাধ্যমে শিশুর সজীবতা প্রকাশ পায়।

১০. **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য :** প্রত্যেক শিশুই আলাদা। তাদের মধ্যে আগ্রহ, প্রবণতা, ক্ষমতা, চাহিদা ইত্যাদির পার্থক্য রয়েছে। মনোবিদ্যায় যাকে বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ব্যক্তিগত পার্থক্য সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করে নিয়ে শিশুর ব্যক্তিগত চাহিদানুযায়ী এই শিক্ষা পরিচালিত হয়ে থাকে।

১১. **সৃজনধর্মিতা :** বিভিন্ন কর্মের অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শিশু তার নিজস্ব সৃজনশীলতাকে ফুটিয়ে তোলে, তাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর এই সৃজন স্পৃহাকে চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের কর্ম সম্পাদনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

শিক্ষা যখন শিশুর জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত হবে তখনই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা উপস্থাপিত হবে এবং শিশুর সার্বিক বিকাশে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করো :—

ক) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জনক হলেন —

(i) ফ্রয়েবেল (iii) মাদাম মন্তেসরি

(ii) রুশো (iv) জন ডিউই

খ) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা —

(i) মনস্তত্ত্বভিত্তিক (iii) ইন্দ্রিয় অনুশীলনের উপর গুরুত্ব দান।

(ii) বিকাশমুখী (iv) উপরের সবগুলি

গ) কোন্‌টি শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার নীতি নয়—

(i) শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী অনুকূল পরিবেশ গঠন করা

(ii) বয়স অনুযায়ী দায়িত্ব অর্পণ

(iii) সমবেতভাবে কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা

(iv) প্রতিযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ঘ) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আন্দোলনের প্রধান কারণ হল —

(i) জৈবিক (iii) মনস্তাত্ত্বিক

(ii) দার্শনিক (iv) সামাজিক

শিখনের ফলাফল :

(১) শিক্ষার্থীদের ক্লাসে সক্রিয় হয়ে থাকতে পারা।

(২) চারিদিকের পরিবেশ ও প্রকৃতিকে অবলম্বন বা গ্রহণ করতে পারবে।

(৩) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলি যাতে শিক্ষার্থীরা ধারণা করতে পারে।

২.৪ শিক্ষার্থীদের প্রেক্ষিত — সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান (Learners in Context : Situating learner in the Social and Cultural context)

উদ্দেশ্য :

শিক্ষার্থীর উপর তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবগুলি বুঝতে সাহায্য করা।

শিশু কোন্ পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করছে তা' খুবই প্রভাবিত করে শিশুর নরম মনকে এবং শিশুকে কখনোই সেই পরিবেশের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাই আমরা বলতে পারি যে, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া যেভাবে সংগঠিত হয় তাকেই পরিস্থিতিগত শিক্ষা (Situational learning) বলা হয়।

শিখন প্রক্রিয়াকে তাই স্বাভাবিকভাবেই দুভাবে ভাবা হয়।

প্রথমত: ব্যক্তিভিত্তিক, এখানে ব্যক্তি তার চিন্তা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা বিশ্বজগৎকে বিবেচনা করে।

দ্বিতীয়ত : শিখন যেহেতু একটি সামাজিক প্রক্রিয়া তাই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

জিন লেভ (Jean Lave)-এর মতে শিক্ষা যেমন পুরোপুরি ব্যক্তির নির্মাণভিত্তিক নয় তেমনি পুরোপুরিভাবে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ারও ফল নয় — বরং এই দুইয়ের সার্থক সমন্বয়।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে শিখন হল সামাজিক ঘটনা যা সেই সময়ের সামাজিক ব্যবস্থা জ্ঞানের এবং কমিউনিটির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। যেমন ধরো আমেরিকাতে যেভাবে শিখন প্রক্রিয়া বিবেচনা হয়, আমাদের দেশে সেইভাবে হয় না। বা আমাদের দেশেই প্রাচীনকালে শিক্ষা যেভাবে ভাবা হতো, আধুনিক সময় কিন্তু তার পুরো পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাই এইভাবেই আমরা বলতে পারি যে আমাদের প্রাচীনকাল ও বর্তমানের সামাজিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক দিক থেকে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

এই ধরনের ধারণা আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের শেখানো খুব কষ্টের হবে না, তার কারণ আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থান থেকে আসে, আমাদের শিক্ষা তাই Unity in Diversity বা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকেই শেখায়।

জাতীয় সংহতি রক্ষা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নই হবে শিক্ষার পরম লক্ষ্য।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

১) নীচের কোনটি সঠিক নয়?

শিখনে প্রভাব বিস্তারকারী পরিবেশগত উপাদানগুলি হল—

ক) দক্ষ শিক্ষক   গ) শিক্ষকের প্রত্যাশা

খ) শিক্ষা নির্দেশনা   ঘ) সাফল্যের আকাঙ্খা

২) শিখনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহের মধ্যে শিক্ষক কোনটির উপরে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করবেন —

ক) শিক্ষার্থী সম্পর্কীয় উপাদান

খ) পরিবেশ সম্পর্কীয় উপাদানের মধ্যে মানব সম্পর্কীয় উপাদান

গ) পরিবেশ সম্পর্কীয় উপাদানের মধ্যে বস্তু সম্পর্কীয় উপাদান

ঘ) শিখন অভিজ্ঞতা সম্পর্কীয় উপাদান।

৩) শিখনের জন্য অনুকূল পরিবেশ হল—

ক) উপযুক্ত বসার ব্যবস্থা

খ) সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতামূলক দলীয় ব্যবস্থা

গ) শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত সমাজ মনস্তত্ত্বমূলক আবহাওয়া

ঘ) উপরের সবগুলি।

শিখনের ফলাফল :

(১) দুটি আলাদা পরিস্থিতিতে দুটি ধারণার তফাত বুঝতে সাহায্য করে।

(২) শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যে কোনো ধারণা গঠন করতে সাহায্য করে।

২.৫ সারাংশ (Summary)

- শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।
- শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার উপাদানের উপর নির্ভরশীল।
- শিক্ষার চারটি উপাদান - শিশু, শিক্ষক, পাঠক্রম ও বিদ্যালয়।
- শিক্ষার এই উপাদানগুলি আলাদা নয়, বরং একে অপরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে শিক্ষার একটি সার্থক রূপদান করে।
- শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবক্তা হলেন জাঁ জ্যাক রুশো, শিক্ষা বিজ্ঞানের জনক।
- প্রাচীনকালের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক ছিলেন মধ্যমণি। কিন্তু শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, সবই শিশুর দিকে লক্ষ্য রেখে স্থির করা হয়।
- শিশুর পরিবেশ (রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক) তার শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। তাকেই অবস্থানগত শিক্ষা বলা হয়।

২.৬ অনুশীলনী (Exercise)

(১) ৫০০ শব্দের মধ্যে শিক্ষার উপাদানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(২) শিক্ষার উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করুন।

(৩) শিক্ষাব্যবস্থায় প্রধান উপাদানটি কী ? এবং কেন?

(৪) আধুনিক শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক — ব্যাখ্যা করুন।

(৫) শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(৬) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(৭) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জনক কে? কেন তাঁকে এই অভিধা দেওয়া হয়।

(৮) অবস্থানগত শিক্ষণ বলতে কী বোঝায়?

(৯) শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে কোন দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়?

২.৭ তথ্য উৎস (Reference)

(১) শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতি — অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায় - বি বি কুন্ডু গ্র্যান্ড সন্স।

(২) শিক্ষাতত্ত্বের রূপরেখা — নূরুল ইসলাম - শ্রীধর প্রকাশনী।

(৩) শিক্ষা তত্ত্ব ও শিক্ষানীতি — গৌরদাস হালদার ও প্রশান্ত শর্মা — ব্যানার্জী পাব্‌লিশার্স।

(৪) শিক্ষা ও দর্শন — দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য।

(৫) Philosophy and Principles of Education – A. Banerjee – B. B. Kundu.

অধ্যায় ৩

শিখন, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষণ

(Learing, Learner and Teaching)

৩.১ সূচনা (Introduction)

পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের মধ্য দিয়ে উন্নততর জীবনযাপনের লক্ষ্য পূরণের স্বার্থে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শিক্ষা প্রক্রিয়ার অন্যতম দুটি বিষয় হল শিখন এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়া। বস্তুত, শিক্ষা বিজ্ঞান শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে আবর্তিত। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন তত্ত্বের প্রয়োগমূলক যথার্থতা শিখন ফলশ্রুতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিখন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, মানসিক গঠন, অন্তর্জাত চাহিদা প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় শিখন প্রক্রিয়ার স্বরূপ উদঘাটনের জন্য শিখনের প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান প্রয়োজন। এছাড়া, যেহেতু শিক্ষার্থীর শিখন ফলশ্রুতির নিরিখে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার যথার্থতা বিচার্য সেহেতু শিক্ষার্থী (কে শিখবে?), শিক্ষক (কে শেখাবেন?) এবং শিখন বস্তুর (কী শিখবে?) পারস্পরিক সম্পর্কটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিখনের বিভিন্ন পন্থা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের তাৎপর্য কতখানি সে সম্পর্কীয় প্রশ্নাবলির উত্তর খোঁজার প্রয়াস আলোচিত হবে এই এককের আলোচনায়।

৩.২ শিখন : ধারণা ও প্রকৃতি (Learning : Concept and Nature)

উদ্দেশ্য :

১। শিক্ষক-শিক্ষার্থী শিখন-এর অর্থ অনুধাবন করবেন।

২। শিক্ষক-শিক্ষার্থী শিখনের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

৩। শিক্ষক-শিক্ষার্থী শিক্ষণ ও শিখনের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে সক্ষম হবেন।

শিখনের ধারণা :

পৃথিবীতে একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে কতকগুলি বংশগত গুণাবলি নিয়ে জন্মায়। এই গুণাবলি শিশুকে তার জৈবিক চাহিদা মেটাতে সহায়তা করে থাকে। প্রত্যেকটি প্রাণীকে পরিবেশের সাথে প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করে চলতে হচ্ছে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য। তাই প্রাণীরা নিত্যনতুন আচরণ সম্পাদন করে চলেছে, যাতে তারা পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে। অর্থাৎ পরিবেশের সাথে সঙ্গতিবিধান করার ক্ষেত্রেও বংশগত গুণাবলি সহায়তা করে থাকে। পরিবেশের সাথে সঙ্গতিবিধান করার জন্য ব্যক্তি যে নিত্যনতুন আচরণ সম্পাদন করে চলেছেন, তাকে 'শিখন' বলা হয়। এটি ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। একটি শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার মন সাদা কাগজের মতো পরিষ্কার থাকে। কালক্রমে পরিবেশের সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে সেই সাদা কাগজে অর্থাৎ শিশুর মনে নানারকম দাগ টানা শুরু হয়ে যায়। এইভাবেই শিশুর জন্মের পরবর্তী মুহূর্ত থেকেই শিখন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

শিখন হল একটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া। শিক্ষা মনোবিদ্যায় এই প্রক্রিয়াটির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। শিখনের সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা নিরূপণে বিভিন্ন মনোবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়। মনোবিদরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। ম্যাকগক্ বলেছেন, ''সক্রিয়তা অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতা সাপেক্ষে ব্যক্তি জীবনে কর্ম সম্পাদনের প্রকৃতি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হল শিখন।'' মনোবিদ হিলগার্ডের মতে, ''প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে উদ্ভূত বা পরিবর্তিত আচরণ সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া হল শিখন।'' শিখনের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে মনোবিদ উডওয়ার্থ বলেছেন, ''শিখন হল এমন একটি ক্রিয়া যা পরবর্তী ক্রিয়ার উপর অপেক্ষাকৃত স্থায়ী একটা ছাপ রেখে যায়।'' কোনো কোনো মনোবিদের মতে, ''শিখন মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়া মাত্র।''

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া সম্ভব হয় না। তাই আধুনিক মনোবিদগণ বিভিন্ন সংজ্ঞার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পর্যালোচনা করে একটি সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। সেটি হল — ‘‘যে মানসিক প্রক্রিয়া অতীত অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের দ্বারা ব্যক্তির আচরণধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্যক্তিকে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধানে সাহায্য করে সেই প্রক্রিয়া হল শিখন।’’

(১) **শিখন ও পরিবেশ :** পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে সঙ্গতি সাধনের জন্য শিখন হয়। ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অভিযোজনের প্রয়োজন। সার্থক অভিযোজনের জন্য ব্যক্তি তার জন্মগত আচরণ কখনো বর্জন করে এবং নতুন আচরণ রপ্ত করে অর্থাৎ, আচরণের পরিবর্তন করে। অতএব পরিবেশের তাগিদে শিখন হয়।

(২) **শিখন ও আত্মসক্রিয়তা :** শিখন ব্যক্তিনির্ভর প্রক্রিয়া। ব্যক্তি যখন নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন অতীত অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ-এর উপর ভিত্তি করে আত্মপ্রচেষ্টায় আচরণের পরিবর্তন করে। অর্থাৎ আত্মসক্রিয়তা ব্যতীত শিখন সম্ভব নয়।

(৩) **শিখন ও শিখনের লক্ষ্য :** প্রয়োজনের তাগিদে পুরানো আচরণ ত্যাগ করে নতুন আচরণ অনুশীলনের দ্বারা আচরণের পরিবর্তন হল শিখন। অর্থাৎ জ্ঞান ও দক্ষতা হল শিখনের ফল। ফল লাভের লক্ষ্যে শিখন প্রক্রিয়া কার্যকর হয়।

(৪) **শিখনের নতুনত্ব :** যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিখন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় সেই অভিজ্ঞতা যেমন নতুন, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ প্রসূত আচরণটিও তেমনি নতুন হয়। অর্থাৎ নতুন পরিস্থিতিতে নতুন আচরণ হল শিখনের প্রকৃতি। শিখনে অভিনবত্ব বর্তমান।

(৫) **শিখন ও প্রেষণা :** ব্যক্তির অন্তর্জাত চাহিদা শিখন প্রক্রিয়াকে কার্যকর করে। প্রেষণা ব্যক্তির অন্তরের এক তাগিদ যা ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিশেষ আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। অর্থাৎ প্রেষণা শিখন সহায়ক মানসিক প্রক্রিয়া।

(৬) **শিখনের ধারা :** ব্যক্তি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচলিত আচরণের পরিবর্তন সাধন করে। এই প্রক্রিয়াটি পর্যায়ভিত্তিক। এই পর্যায়গুলি শিখন লেখ-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। অতএব শিখন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়।

(৭) **শিখন ও পরিণমন :** জন্মগত প্রবণতার স্বাভাবিক বিকাশের ফলে আচরণের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হল পরিণমন। অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ দ্বারা আচরণের পরিবর্তন হল শিখন। শিখন ও পরিণমন পরস্পর নির্ভরশীল। বিভিন্ন স্তরে পরিণমনের অভাব থাকলে শিখন সম্ভব হয় না।

(৮) **শিখন ও সঞ্চালন :** শিখনের ফলে ব্যক্তি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা অন্য পরিস্থিতিতে কাজে লাগানো সম্ভব। একে বলা হয় শিখন সঞ্চালন। শিখন সঞ্চালনের ধনাত্মক প্রভাবকেই আমরা শিখনে কার্যকরী করার চেষ্টায় রত হব। শিখনের ঋণাত্মক সঞ্চালনকে যথাসম্ভব প্রতিহত করার চেষ্টা করব।

শিখনের বৈশিষ্ট্য : উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে দিয়ে শিখন প্রক্রিয়ার প্রকৃত অর্থ ও ধারণা প্রকাশিত হয় না। শিখন প্রক্রিয়ার মতো জটিল প্রক্রিয়ার সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে গেলে প্রক্রিয়াটির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। তাই শিখনের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচিত হল—

- **শিখন ও অভিযোজন :** প্রত্যেকটি প্রাণী পরিবেশে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য নিত্যনতুন আচরণ সম্পাদন করে চলেছে, এই আচরণ সম্পাদনকেই শিখন বলা হয়। অন্যদিকে এই শিখন না হলে ব্যক্তি পরিবেশে অভিযোজন করে চলতে পারবে না। সুতরাং পরিবর্তনশীল পরিবেশে অভিযোজন করে চলার জন্য শিখন সহায়তা করে থাকে।

- **শিখন ও প্রেষণা :** প্রেষণা শিখন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে থাকে। প্রেষণা হল এমন একটি মানসিক অবস্থা যা ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ আচরণ সম্পাদন করতে উদ্বুদ্ধ করে। এমনকি ব্যক্তির আচরণ ধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে থাকে।

- **শিখন ও গতিপথ :** শিখনের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। একজন ব্যক্তির মধ্যে আচরণের পরিবর্তনের ফলে শিখন ঘটে। এই পরিবর্তিত আচরণের একটি গতিপথ থাকে। এর সাহায্যেই ব্যক্তি তার চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটাতে পারে।
- **শিখন ও আত্মসক্রিয়তা :** পরিবর্তিত পরিবেশে সঙ্গতি বিধান করার জন্য ব্যক্তিকে সক্রিয় হতে হবে। তবেই সে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে। শিখনের জন্যও ব্যক্তিকে সক্রিয় হতে হবে। কেবলমাত্র অতীত অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণ শিখনের একমাত্র শর্ত নয়।
- **শিখন ও ভারসাম্য :** শিখনের ফলে ব্যক্তির আচরণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর ফলে একদিকে ব্যক্তির চাহিদাও পরিপূর্ণ হয়ে যায়। অপরদিকে সামাজিক চাহিদাও পরিতৃপ্ত হয়। অর্থাৎ ব্যক্তিজীবনে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দিকের মধ্যে ভারসাম্য গড়ে ওঠে।
- **শিখন ও উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া :** উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপিত হলে নতুন আচরণের সৃষ্টি হয়। এর ফলেই শিখন ঘটে। শিখন ব্যক্তি জীবনের সকল দিককে প্রভাবিত করে থাকে। তাই বলা যায় যে শিখনের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি হয় এবং নতুন নতুন আচরণ গড়ে ওঠে।
- **শিখন ও সঞ্চালন :** শিখনলব্ধ অভিজ্ঞতা বাস্তব ক্ষেত্রে সঞ্চালন করার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। ব্যক্তিজীবনের বিকাশ সমাজজীবনের উন্নতি সাধন করে থাকে। তবে সবক্ষেত্রে শিখন সঞ্চালন সম্ভব হয়ে ওঠে না।
- **শিখন ও অনুশীলন :** শিখনকে দৃঢ় করতে হলে অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। নতুন আচরণ সৃষ্টি করতে হলে পুরানো আচরণ বারংবার সম্পাদন করতে হয়। এইভাবে বারবার কোনো আচরণের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হলে সেটি অভ্যাসে পরিণত হবার সম্ভবনা থেকে যায়। অপরদিকে অভ্যাস গঠনের অন্যতম শর্ত হল অনুশীলন।
- **শিখন ও সমস্যা সমাধান :** শিখনের মধ্যে দিয়ে কেবলমাত্র নতুন আচরণ সৃষ্টি এবং পরিবেশের সাথে সঙ্গতিবিধান সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, শিখনের মাধ্যমে ব্যক্তি নানাবিধ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়।
- **শিখনে উৎকর্ষসাধন :** শিখনকে কেবলমাত্র দৃঢ় করা সম্ভব তাই নয়, শিখনের উৎকর্ষতা নির্ভর করে কয়েকটি শর্তের ওপর। সেগুলি হল— স্থান, কাল, আগ্রহ, মনোযোগ, শিখন পদ্ধতি, দৈহিক সক্ষমতা, এবং মানসিক প্রস্তুতি ইত্যাদি। শিখনের লেখচিত্রের মাধ্যমে শিখনের হারকে প্রকাশ করা যায়।

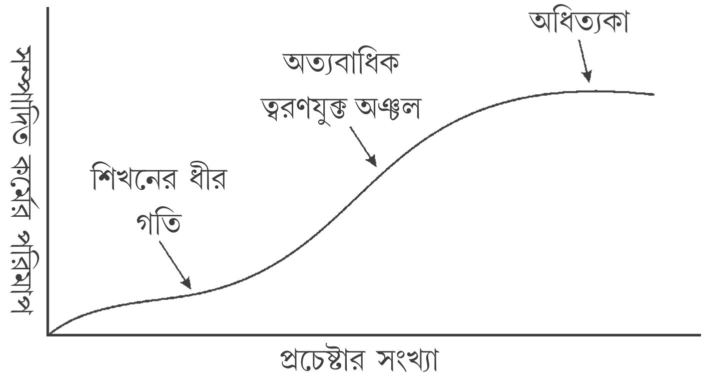

শিখনের লেখচিত্র

এই লেখচিত্র থেকে শিখনের গতিপথ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। প্রথমে ধীর গতিতে শিখন শুরু হলেও শিখনের গতি একসময় খাড়াভাবে উর্ধ্বমুখী হয় এবং পরবর্তীকালে একটা স্থিতাবস্থা আসে। লেখচিত্রের এই অঞ্চলকে অধিত্যকা বলা হয়। এই সময় শিখন তার ঊর্ধ্বগতি প্রায় হারিয়ে ফেলে। এর ফলে লেখচিত্রে এই অঞ্চলকে অনেকটা সমতলের মতো দেখায়।

নিজ অগ্রগতি যাচাই করুন :

১. সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন —

(i) নিম্নলিখিত কোনটি শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক/মনস্তাত্ত্বিক ফ্যাক্টর নয়—

a) মনোযোগ c) আগ্রহ

b) অনুভূতি d) বয়স

(ii) শিখন একটি কৃত্রিম প্রক্রিয়া— উদ্ধৃতিটি—

a) সত্য c) আংশিক সত্য

b) মিথ্যা d) আংশিক মিথ্যা

২. দু'একটি বাক্যে উত্তর দিন (অনধিক ৩০টি শব্দ)

(i) শিখনের বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলি পর্যালোচনা করে একটি কার্যকর সংজ্ঞা লিখুন।

(ii) শিখনের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

৩. সংক্ষেপে উত্তর দিন— (অনধিক ২৫০টি শব্দ)

(i) শিখনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

ফলাফল :

১। শিক্ষক-শিক্ষার্থী শিখনের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারবেন।

২। শিক্ষক-শিক্ষার্থী শিখনের মাধ্যমে কীভাবে আচরণের পরিবর্তন হয় তা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হবেন।

৩। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে সংকটকালীন পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হবেন।

৪। শিক্ষক-শিক্ষার্থী শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার গুণগত মানোন্নয়নের সহায়ক হবেন।

৩.৩ শিখন : জ্ঞান ও দক্ষতা (Learning: Knowledge and Skills)

উদ্দেশ্য :

১। শিক্ষার্থী-শিক্ষক জ্ঞান ও দক্ষতার অর্থ উপলব্ধি করবেন।

২। শিক্ষার্থী-শিক্ষক প্রজ্ঞামূলক বা জ্ঞানমূলক শিখন-এর অর্থ অনুধাবন করবেন।

৩। শিক্ষার্থী-শিক্ষক দক্ষতার বিভিন্ন ধারাগুলি বুঝতে সক্ষম হবেন।

বিষয়বস্তু :

আচরণের ভিন্নতা অনুযায়ী শিখনকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমত, জ্ঞানমূলক শিখন বা বৌদ্ধিক শিখন। দ্বিতীয়ত, দক্ষতামূলক শিখন।

জ্ঞান : জ্ঞানমূলক শিখন হল সেই শিখন প্রক্রিয়া যেখানে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা অর্জন হয়। ধারণা শিখন ও সমস্যা সমাধানের শিখনকে জ্ঞানমূলক শিখনের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন দ্বারা নতুন অভিজ্ঞতা বা ধারণা গঠনের মধ্য দিয়ে জ্ঞানকে আত্মস্থ করতে হয়। প্রজ্ঞামূলক শিখন সম্পর্কে পিঁয়াজের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলে জ্ঞানমূলক শিখনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। পিঁয়াজের মতানুযায়ী ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতার সাথে নতুন অভিজ্ঞতার সংযুক্তি দ্বারা আচরণের পরিবর্তন সাধিত হয়। সমগ্রতাবাদীদের দেওয়া বিভিন্ন শিখন তত্ত্বগুলি প্রজ্ঞামূলক শিখনের অন্তর্ভুক্ত।

দক্ষতা : ব্যক্তির কর্ম সম্পাদনে পারদর্শিতা হল দক্ষতা। ব্যক্তির দৈহিক দক্ষতা ও প্রত্যক্ষণমূলক শিখনকে দক্ষতা শিখনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শরীরের গ্রাহক অঙ্গ বা Receptor এবং কারক অঙ্গ Effector-এর সার্থক সমন্বয়ে ব্যক্তি কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। যেমন— হাঁটা, সাইকেল চালানো ইত্যাদি। এই সকল কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পুনরাবৃত্তি বা শিখন প্রয়োজন। সংযোজনবাদ বা সংযোগমূলক শিখন দক্ষতা শিখনের অন্তর্গত।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

১. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন—

(i) জ্ঞানমূলক শিখনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় হল

(a) আদর্শ, মনোভাব, মূল্যবোধ

(b) প্রত্যক্ষণমূলক , ধারণা, সমস্যা সমাধান

(c) ধারণা, দক্ষতা, মনোভাব

(d) কোনোটি নয়।

(ii) দক্ষতামূলক শিখনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় হল—

(a) আদর্শ, মনোভাব, মূল্যবোধ

(b) ধারণা, দক্ষতা, সমস্যা সমাধান

(c) প্রতক্ষ্যমূলক, দক্ষতা, দৈহিক পটুতা

(d) কোনোটি নয়।

২. কয়েকটি বাক্যে উত্তর দিন— (অনধিক ৩০ টি শব্দ)

(i) জ্ঞান বলতে কী বোঝায়?

(ii) দক্ষতা বলতে কী বোঝায়?

৩. সংক্ষেপে উত্তর দিন— (অনধিক ২০০টি শব্দ)

(i) আপনার মতে শিখন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কী কী করণীয় সেই বিষয়ে বন্ধুদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে রিপোর্ট লিখুন।

শিখনের ফলাফল :

১। শিক্ষক-শিক্ষার্থী জ্ঞান এবং দক্ষতার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে সক্ষম হবেন।

২। শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রজ্ঞামূলক শিখনের বিভিন্ন ধাপগুলি উপলব্ধি করবেন।

৩। শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রজ্ঞামূলক বা জ্ঞানমূলক শিখনের বিকাশে এর ভিন্ন ভিন্ন ধারাগুলির মধ্যে সম্পর্ক অনুধাবন করবেন।

৩.৪ শিখনের বিভিন্ন পদ্ধতি (Different ways of learning)

উদ্দেশ্য :

১। শিক্ষক-শিক্ষার্থী শিখনের বিভিন্ন পথগুলি বুঝতে সক্ষম হবেন।

২। শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিভিন্ন শিখন পদ্ধতিগুলির সীমাবদ্ধতাগুলি উপলব্ধি করবেন।

৩। শিক্ষক-শিক্ষার্থী শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার শিখন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সমর্থ হবেন।

বিষয়বস্তু :

শিখনের প্রকারভেদ : মনোবিদ্রা শিখনকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যেমন— জ্ঞানমূলক শিখন, বোধমূলক শিখন। বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য দেহের বিভিন্ন অংশের সঞ্চালনমূলক দক্ষতার প্রয়োজন হয়। তার জন্য রয়েছে সঞ্চালনমূলক দক্ষতার শিখন। আবেগ সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য রয়েছে আবেগ সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়ার শিখন ইত্যাদি। কিন্তু শিখনের এই শ্রেণিগুলি পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে। তাই প্রাধান্যের ভিত্তিতে মনোবিদ গ্যানে শিখনকে আটটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল—

(১) সাংকেতিক শিখন

(২) উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার শিখন

(৩) শৃঙ্খলা শিখন

(৪) বাচনিক অনুষঙ্গ সংক্রান্ত শিখন

(৫) বহুমুখী পৃথকীকরণ

(৬) ধারণার শিখন

(৭) নীতি নির্ধারণের শিখন

(৮) সমস্যা সমাধানের শিখন

(১) সাংকেতিক শিখন : সাংকেতিক শিখনকে বিজ্ঞানী প্যাভলভ প্রবর্তিত প্রাচীন অনুবর্তনীয় শিখন রূপে গণ্য করা হয়। প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বে প্যাভলভ দেখিয়েছেন যে অনাবর্তিত উদ্দীপক রূপে খাদ্য এবং অনুবর্তিত উদ্দীপক রূপে ঘণ্টাধ্বনিকে যদি একত্রিত করে একটি কুকুরের সামনে একাধিকবার উপস্থাপন করা হয় তাহলে কেবলমাত্র শর্ত নিরপেক্ষ উদ্দীপক রূপে ঘণ্টা বাজানো হলে কুকুরের প্রতিক্রিয়া রূপে তার মুখ থেকে লালা নিঃসরণ হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে আচরণের যে পরিবর্তন হল তাকে বলে কন্ডিশনিং বা বিশেষ অবস্থা প্রাপ্তি। এছাড়া সংকেত বা উদ্দীপকের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়ার সাধারণীকরণ হয়ে থাকে। যেমন— রাস্তায় লাল সংকেত দেখলে গাড়ি থেমে যায় আবার সবুজ সংকেত দেখলে গাড়ি চলতে শুরু করে।

(২) উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার শিখন : উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার শিখনকে সাধারণত সক্রিয় অনুবর্তন রূপে গণ্য করা যায়। থর্নডাইক এই বিষয়ে পরীক্ষামূলক গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে একটি পাজেল বাক্সে বন্দি করে দেন এবং বাক্সের বাইরে একটি পাত্রে কিছু খাবার রেখে দেন। বাক্সের ভিতরে তিনি একটি লিভার তৈরি করে রেখে দিয়েছিলেন। যাতে চাপ দিয়ে বিড়ালটি বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবে। এই প্রতিক্রিয়া করার ফলে বিড়ালটি পুরস্কার স্বরূপ খাবার পাবে। এই ধরনের শিখনকে সক্রিয় অনুবর্তন বলা হয়। এই অনুবর্তন প্রাচীন অনুবর্তনের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয়। কারণ এখানে শর্তসাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে পরীক্ষককে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হয় কখন পরীক্ষাধীন প্রাণীটি পরীক্ষকের কাঙ্খিত ফলের সাথে যুক্ত প্রতিক্রিয়া করবে। এরপর পরীক্ষক পরীক্ষার ফলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন।

(৩) শৃঙ্খলা শিখন : শৃঙ্খলায়ন বলতে কয়েকটি স্বতন্ত্রতার সমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক পর্যায়ক্রমিক যোগসূত্র-কে বোঝায়। শৃঙ্খলায়ন সাধারণত দুই প্রকারের হয়। যথা- সঞ্চালনামূলক শৃঙ্খলায়ন এবং বাচনিক শৃঙ্খলায়ন। সঞ্চালনমূলক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট শৃঙ্খল শিখনকে সঞ্চালনামূলক শৃঙ্খলায়ন বলা হয়। যেমন ওয়াশিং মেশিন চালনা করা, ঘোড়ায় চড়া এবং গাড়ি চালানো

ইত্যাদি। অন্যদিকে বাচনিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট শৃঙ্খল শিখনকে বাচনিক শৃঙ্খলায়ন বলা হয়। যেমন— কোনো ব্যক্তিকে অভিবাদন জানানো ইত্যাদি।

(৪) **বাচনিক অনুষঙ্গ সংক্রান্ত শিখন :** সামাজিক পরিস্থিতিতে একজন মানুষ তার বাচনিক দক্ষতার সাহায্যে বহুমুখী দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। একজন ব্যক্তি বা শিশুর মধ্যে সাধারণ বাচনিক শৃঙ্খলায়ন নামকরণের ক্ষেত্রে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একজন শিশুকে একটি বস্তু দেখিয়ে বলা হল যে এটি একটি গাড়ি। পরবর্তীকালে ওই নির্দিষ্ট বস্তুটিকে শিশু যখন দেখবে তখন সে সেটাকে গাড়ি বলে চিহ্নিত করতে পারবে।

(৫) **বহুমুখী পৃথকীকরণ :** পৃথকীকরণ তখনই ঘটবে যখন কোনো প্রদত্ত উদ্দীপকের প্রতি ব্যক্তির অন্যান্য প্রতিক্রিয়া বাদ দিয়ে শুধুমাত্র একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটবে। একটি শিশু প্রথম থেকেই বিভিন্ন বস্তুর থেকে পার্থক্য বুঝতে পারে। যেমন— একটি দুধের বোতল এবং একটি সাধারণ বোতলের মধ্যে পার্থক্য সে বুঝতে পারে। উচ্চ পর্যায়ের মানসিক প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে ব্যক্তি সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়। এই উচ্চ পর্যায়ের মানসিক প্রক্রিয়া পৃথকীকরণের জন্য আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন হয়।

(৬) **ধারণার শিখন :** ধারণার শিখনের জন্য প্রথমে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাধারণীকরণ ও পৃথকীকরণ সম্পর্কে শিখতে হবে। যেমন— ব্যক্তি উদ্দীপক রূপে বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত বস্তু নিয়ে কাজ করে। এক্ষেত্রে ফলকে একটি উদ্দীপক রূপে ধরা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের ফল হয়। যথা- আম, জাম, আঙুর, আতা, কলা, কমলালেবু ইত্যাদি। প্রত্যেকটি ফল একইরকম হয় না। কোনোটার আকার বড়ো হয়, কোনোটার আকার ছোটো হয়। কোনোটা আবার মিষ্টি হয়, কোনোটা আবার টক হয়। তবে প্রত্যেকটি ফলের নির্দিষ্ট কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। যার ভিত্তিতে এগুলিকে ফল শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এগুলিকে অন্যান্য বস্তু যেমন— পশু, পাখি অথবা অন্যান্য খাদ্যবস্তু থেকে পৃথক করতে পারা যায়। এইভাবে সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে পৃথকীকরণ করা হয়।

(৭) **নীতি নির্ধারণের শিখন :** দুই বা ততোধিক ধারণাসমূহের মধ্যে নিয়মিত অন্তর্বর্তী সম্পর্ককে নীতি বলা হয়। নীতি নির্ধারণের শিখন অন্যান্য বিষয়ের শিখন ও ধারণা গঠনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা যেসমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে তার বেশীরভাগই নীতির প্রগতি ও সম্প্রসারণের কাজে সহায়তা করে থাকে। চারপাশের পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলার জন্য এবং জীবনযাপনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রাণীকে একাধিক নীতি মেনে চলতে হয়। সেই কারণে ব্যক্তি যাতে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে তাই সে বিভিন্ন বিষয়ের নীতিগুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

(৮) **সমস্যা সমাধানের শিখন :** সমস্যা সমাধানমূলক শিখনের জন্য প্রথমেই বিশেষ কিছু দক্ষতার প্রয়োজন হয়। যেমন— যুক্তিবোধ, পর্যবেক্ষণের দক্ষতা, চিন্তাশক্তি, পৃথকীকরণ, অনুমান করার ক্ষমতা, পরীক্ষানিরীক্ষা করার ক্ষমতা ইত্যাদি। শিখনের পর্যায়ক্রমিক শ্রেণি কাঠামোর উচ্চতর পর্যায়ে সমস্যা সমাধানের শিখন অবস্থান করেছে। একজন ব্যক্তি যদি কোনো সমস্যার সমাধান করতে চান তাহলে তাঁকে পূর্ব অভিজ্ঞতা, অর্জিত জ্ঞান, প্রথাগত ও প্রথা-বহির্ভূত শিখন ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। সমস্যা সমাধানের শিখনের সাহায্যে ব্যক্তি সামাজিক উন্নতি ও বিকাশ সাধনকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে পারবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে আচরণ ধারার যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তার ওপর ভিত্তি করে আরও কটি বিভিন্ন শিখনের পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। এগুলি হল—

(১) **বাচনিক শিখন :** এই শিখন আমাদের বাচনিক আচরণ অর্জন করতে সহায়তা করে। যেমন-আমরা যে ভাষায় কথা বলি, যোগাযোগ সাধন করি তা এই শিখনের ফল।

(২) **দক্ষতার শিখন :** সকল প্রকার দক্ষতাসম্পন্ন কাজ যেমন—সাঁতার কাটা, ঘোড়ায় চড়া, গাড়ি চালানো এই শিখনের অন্তর্গত। শরীরের আভ্যন্তরীণ সংগ্রাহক ও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা এই শিখন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত।

(৩) **প্রচেষ্টা ও ভুলের শিখন :** অনেক পরিস্থিতিতে প্রচেষ্টা এবং ভুলের দ্বারা শিখন হয়। এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের অনেকগুলি প্রচেষ্টা করা হয়। প্রয়োজনীয় সফল প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করে এবং অপ্রয়োজনীয় প্রচেষ্টাকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ ভুল পথ ত্যাগ করে সঠিক পথ গ্রহণের যে শিখন কার্য সম্পন্ন হয় তা প্রচেষ্টা ও ভুলের শিখন।

(৪) **প্রাচীন অনুবর্তন দ্বারা শিখন :** এই শিখন পরিস্থিতিতে একটি স্বাভাবিক উদ্দীপকের সাপেক্ষে প্রাণী/ব্যক্তি যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করে তা অন্য অস্বাভাবিক উদ্দীপক দ্বারা ঘটানো যায়। যেমন, ট্রাফিক সিগন্যালের আলো দেখে পথ চলা।

(৫) **ধারণা শিখন :** ধারণা বলতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে ওঠা মানসিক পরিস্ফূটনকে বোঝায়। যেমন— 'ফুল' বললে তার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা/যেগুলি আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতায় বর্তমান তার সাথে মিলিয়ে নিই। এই বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া হল ধারণা শিখন।

(৬) **পর্যায় ক্রমিক শিখন :** এই পরিস্থিতিতে শিখনবস্তুকে কয়েকটি পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করা হয়, এই প্রক্রিয়ায় নামতা শেখা হয়।

(৭) **অনুকরণ শিখন :** কোন একটি আচরণকে পর্যবেক্ষণ করে সেই মতো আচরণ করার প্রচেষ্টাকে বলা হয় অনুকরণ। ব্যক্তি সম্পাদিত আচরণের উন্নয়নের জন্য অন্যের আচরণ নকল করে। এই প্রক্রিয়ায় যে শিখন হয় তা অনুকরণ শিখন।

(৮) **অন্তঃদৃষ্টি শিখন :** এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী সমগ্র পরিস্থিতি বোঝার প্রচেষ্টা করে এবং শিখন পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির সাথে সমগ্র পরিস্থিতির সম্পর্ক নির্ধারণ করে। শিখন পরিস্থিতির সমগ্র অংশের সাথে বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক প্রত্যক্ষণ হল অন্তঃদৃষ্টি শিখন।

অর্থপূর্ণ শিখন এবং বোধহীন শিখন : ডেভিড আশুবেল অর্থপূর্ণ শিখনকে বোধহীন শিখনের বিপরীত রূপে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে অর্থপূর্ণ শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নতুন জ্ঞান এবং ধারণাগুলিকে পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে হবে। আশুবেল তাঁর শিখন তত্ত্বে অগ্রণী সংগঠকের ধারণাটি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত নতুন ধারণা অর্জন করবে সেগুলিকে আরো মজবুত করতে হবে। এই ধরনের ধারণাকেই তিনি অগ্রণী সংগঠক বলেছেন। এই অগ্রণী সংগঠকের মূল উদ্দেশ্য হল এমন একটি মানসিক কাঠামো সরবরাহ করা যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নতুন ধারণা অর্জন করতে পারবে।

অর্থপূর্ণ শিখন : অর্থপূর্ণ শিখনে নতুন জ্ঞানকে অনেক বেশি সুবিন্যস্ত ও স্থায়ীভাবে বৌদ্ধিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে শিখন কোনো বস্তু বা ঘটনার অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত থাকে এবং পূর্বে অর্জিত জ্ঞানের সাথে নতুন জ্ঞানকে যুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

বোধহীন শিখন : বোধহীন শিখনে নতুন জ্ঞানকে কেবলমাত্র আক্ষরিক অর্থে বৌদ্ধিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে কোনো স্থায়ী এবং সুবিন্যস্ত রূপ দেখতে পাওয়া যায় না। এমনকি বৌদ্ধিক কাঠামোর মধ্যে যে জ্ঞান পূর্ব থেকেই আছে তার সাথে নতুন জ্ঞানকে যুক্ত করার কোনো প্রচেষ্টা থাকে না। বোধহীন শিখনে কোনো ঘটনা বা বস্তুর অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত হয়ে শিখন সম্ভব হয় না এবং পূর্বে অর্জিত জ্ঞানের সাথে নতুন জ্ঞানকে যুক্ত করার কোনো প্রবণতা লক্ষ করা যায় না।

অংশগ্রহণমূলক শিখন : জেরেমি ডগলাসের (Jeremy Douglass) মতে অংশগ্রহণমূলক শিখন হল একটি প্রতিক্রিয়ামূলক ও নমনীয় পাঠক্রমের মধ্যে দিয়ে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত থেকে শিক্ষার্থীর উন্নত মনোভাব সূচক অবস্থা। পরিপূর্ণ অংশগ্রহণমূলক শিখন সার্থক শিখনকে বাস্তবায়িত করার জন্য পারস্পরিক কথপোকথন চক্রটিকে সম্পূর্ণ করার ওপর গুরুত্ব দেয়, এর ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠক্রমের উপাদানগুলির লক্ষ্য অর্জনে প্রচেষ্টা চালাতে পারে। তবে প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে হলে পাঠক্রমের উপাদান এবং মাধ্যম এই দুটির পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয়।

আধুনিক শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই অংশগ্রহণমূলক শিখন সক্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এই সমস্যাগুলি শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস করছে। তাই বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষায় গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে অংশগ্রহণমূলক শিখনের কয়েকটি কৌশল নিম্নে আলোচনা করা হল—

সহযোগিতামূলক শিখন : সহযোগিতামূলক শিখন একটি সর্বোৎকৃষ্ট শিখন পদ্ধতি। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দল গঠন করে কার্যসম্পাদন করে থাকে। শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে কার্যসম্পাদন করার ফলে তারা একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারে, একে অন্যের দক্ষতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগানোর সুযোগ পেতে পারে। তাছাড়া তথ্যের আদান-প্রদান করাও এই শিখনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দলগত অবস্থান অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা-মনিটর করা, তথ্য সরবরাহ করা, সংরক্ষণ করা, সংগঠন করা— প্রভৃতি ভূমিকা পালন করতে পারে। দলের মধ্যে কোনো নেতা থাকে না, যার ওপর সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হবে। দলের সকল সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব আবর্তিত হয়। এই ধরনের শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দলগত সহযোগিতার অভিজ্ঞতা যেমন লাভ করার সুযোগ পায় তেমনি চারপাশের পরিবেশ এবং মানুষজন সম্পর্কেও অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ পায়, যেগুলি তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুদৃঢ় করে তোলে। তাই এক্ষেত্রে শিক্ষকদের দায়িত্ব হল শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা এবং কার্য সম্পাদনের পথকে সুগম করে তোলা।

অনুসন্ধিৎসামূলক শিখন : একটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও সক্রিয়তাভিত্তিক শিখনতত্ত্ব হল অনুসন্ধিৎসামূলক শিখন। শিক্ষার্থীরা যাতে জটিল চিন্তা করতে সক্ষম হয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে এবং সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হতে পারে সে বিষয়ে এই তত্ত্বটি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের বাস্তবিক জীবনের সাথে ওতোপ্রতভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই শিখনতত্ত্ব। উপরিউক্ত দক্ষতাগুলি যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকশিত হতে পারে তার জন্য বিদ্যালয়গুলির প্রতিটি শ্রেণিতে অনুসন্ধিৎসামূলক শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন। এই পদ্ধতির কিছু সুবিধা আছে। শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহের দক্ষতা এবং তথ্য মূল্যায়ন করার জন্য যে সকল কৌশল ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় সে বিষয়েও অনুসন্ধিৎসামূলক শিখন তত্ত্ব সহায়তা করে থাকে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শিখনের পথ নিজেরা নির্বাচন করে নিতে পারে। পাঠক্রমের অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে নির্দিষ্ট বিষয়টি যুক্ত হওয়ায় পাঠক্রমের সুসংহত রূপে গড়ে ওঠা সম্ভব হয়। তাই বলা যায় যে অনুসন্ধানমূলক শিখন পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত একটি শিখন পদ্ধতি।

প্যারোটিং : প্যারোটিং বিষয়টিকে টিয়া পাখির সাথে কথা বলার মতো বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ওপর প্যারোটিং পদ্ধতি প্রয়োগ করলে সেটি ফলদায়ী হয়ে থাকে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক পাঠ্যবিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সঠিক উত্তর সংগ্রহ করবেন। এরপর সেই উত্তরটি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে পুনরাবৃত্তি করবেন। এই পদ্ধতিকেই প্যারোটিং বলে।

পরীক্ষণমূলক শিখন : পরীক্ষণমূলক শিখনে শিক্ষার্থীদের কাজের মাধ্যমে শেখানো হয়। এই ধরনের শিখনকে প্রথাযুক্ত নিয়ন্ত্রিত শ্রেণিকক্ষযুক্ত শিখন বলা যায়। পরীক্ষণমূলক শিখনের মূল উদ্দেশ্য হল প্রকৃতির সাথে শিক্ষার্থীদের একটি সংযোগ তৈরি করা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের লড়াই করতে শেখানো। এই শিখনে যেহেতু শিক্ষার্থীরা কাজের মাধ্যমে

শেখে তাই যেকোনো রকমের কর্মকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে এই ধরনের শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই সক্রিয় থাকতে হবে। কারণ পরীক্ষামূলক শিখন সম্পূর্ণ করতে গেলে প্রচলিত তত্ত্বের প্রয়োগ করা হয় এবং সেখানে সক্রিয়তার প্রয়োজন আছে।

আবিষ্কারমূলক শিখনের সংজ্ঞা : ব্রুনারের মতানুযায়ী আবিষ্কারমূলক শিখন হল অনুসন্ধিৎসাভিত্তিক গঠনবাদী একটি শিখনতত্ত্ব। এটি সমস্যা সমাধানমূলক পরিস্থিতিতে ঘটে থাকে যেখানে শিক্ষার্থী তার পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান জ্ঞানের উপর নির্ভর করে সত্য ঘটনা ও ঘটনার মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্ক আবিষ্কার করে থাকে। শিক্ষার্থী শুধুমাত্র তার পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে তাই নয়, বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে এবং পরীক্ষামূলক গবেষণার মাধ্যমে কাঙ্খিত বস্তুকে খুঁজে বের করে। এর ফলে শিক্ষার্থীর নিজের আবিষ্কৃত ধারণা ও জ্ঞানগুলি মনে রাখার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। আবিষ্কারমূলক শিখন মডেলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মডেলগুলি হল— পরিচালিত আবিষ্কার, সমস্যাভিত্তিক শিখন, বাস্তবসদৃশ শিখন, কেসভিত্তিক শিখন, ঘটনাচক্রে শিখন ইত্যাদি।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

১. সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন —

(i) শিখনের দ্বারা আচরণ পরিবর্তন করতে প্রয়োজন—

(a) অভিজ্ঞতা (c) অনুভূতি

(b) দক্ষতা (d) অনুশীলন ও ফল লাভ

(ii) ‘পিয়ানো বাজানো’ কোন ধরনের শিখন পরিস্থিতির ফল—

(a) সমস্যা সমাধানমূলক শিখন। (c) দক্ষতামূলক শিখন

(b) অন্তঃদৃষ্টিমূলক শিখন (d) ওপরের কোনোটিই নয়

(iii) শিখনের ক্ষেত্রে অনুবর্তন প্রধানত—

(a) তিনপ্রকার (c) চারপ্রকার

(b) দুই প্রকার (d) কোনোটি নয়।

২. সংক্ষেপে দুই-তিন বাক্যে উত্তর দিন— (অনধিক ৩০ টি শব্দ)

(i) ধারণা শিখন বলতে কী বোঝেন?

(ii) অন্তঃদৃষ্টিমূলক শিখন বলতে কী বোঝায়?

৩. সংক্ষেপে উত্তর দিন (অনধিক ২০০ টি শব্দ)

(i) যে কোনো পাঁচটি শিখন পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

শিখনের ফলাফল :

১। শিক্ষার্থী-শিক্ষক বিভিন্ন শিখন পদ্ধতির নীতিগুলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

২। শিক্ষার্থী-শিক্ষক শিখনের বিভিন্ন পন্থাগুলির উপযোগিতা এবং সীমাবদ্ধতা নিরূপণ করতে পারবেন।

৩। শিক্ষার্থী-শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন শিখন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন।

৩.৫ শিখনের ধারণা, অর্থ ও শিক্ষণের সহিত শিখন ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক (Meaning of Teaching its relationship with learning and learner)

উদ্দেশ্য :

১। শিক্ষণ-এর তথ্য এবং প্রকৃতি বুঝতে সক্ষম হবে।

২। শিখন এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে।

৩। শিখন প্রক্রিয়া এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হবে।

বিষয়বস্তু :

শিশুর তথা শিক্ষার্থীর বিকাশের জন্য শিক্ষক যে কাজ করেন তাই হল শিক্ষণ। শিক্ষণ হল বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জনের অভিপ্রায়ে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়া। সাধারণ অর্থে শিক্ষণ হল শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার তিনটি প্রধান চলরাশি হল— স্বাধীন চলরাশি রূপে শিক্ষক, অধীন চলরাশি রূপে শিক্ষার্থী এবং মধ্যস্থতাকারী চলরাশি বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনা। অতএব বলা যায় শিক্ষণ হল একটি ত্রিমেরুবিশিষ্ট প্রক্রিয়া। শিক্ষণ একটি মিথস্ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি কয়েকটি Phase বা স্তরের মধ্যে দিয়ে সংঘটিত হয়। শিক্ষণের স্তরগুলি হল (ক) প্রাক সক্রিয়তার স্তর, এই স্তরে শিক্ষক শিক্ষণীয় বস্তু এবং পাঠদান স্ট্র্যাটেজি নির্দিষ্ট করেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক সংগঠন, চাহিদা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষকের বিচার্য বিষয়। (খ) অন্তর-সক্রিয়তার স্তর, এই স্তরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর, শিক্ষণীয় বস্তু/বিষয়কেন্দ্রিক মিথস্ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। (গ) উত্তর সক্রিয়তা স্তর, এই স্তরে যে সকল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূর্ব নির্ধারিত ছিল সেগুলি পূরণ হয়েছে কি জানার জন্য শিক্ষক অভীক্ষা কৌশল গ্রহণ করেন অর্থাৎ শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপূরণের সহায়ক কি না তা শিক্ষক খতিয়ে দেখেন।

শিশু শিক্ষার্থীকে তার পরিবর্তনশীল পরিবেশে সার্থকভাবে অভিযোজিত করার অভিপ্রায়ে শিক্ষণ শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভকে প্রশিক্ষিত করে। শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠন, বয়স, চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষণীয় লক্ষ্য নির্ণয় করেন এবং সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষণীয় বস্তু শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করেন এবং বাঞ্ছিত লক্ষ্যপূরণ হয়েছে কি না তা যাচাই করার কৌশল রচনা করেন। শিক্ষক তাঁর জ্ঞান এবং দক্ষতা সঞ্চালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের সংস্কারসাধন করেন। শিক্ষণ ও শিখনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের আচরণকে শিখনের জন্য ব্যবস্থাপনা করার প্রক্রিয়াই হল শিক্ষণ। তার মাপকাঠি হল শিক্ষণ। শিক্ষাকে বিনিয়োগ রূপে গ্রহণ করা হয়।

ডিউই-এর মতে, "Education is development of all these capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfil his capabilities."

শিখন ও শিক্ষণ পরস্পরের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। শিখন হয়েছে কিনা জানার জন্য বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী তাঁদের নিজস্ব চিন্তার ক্ষেত্র হিসাবে সেটি আলোচনা করেছেন। শিখনের ফলে আচরণের পরিবর্তন ঘটে। প্রত্যক্ষভাবে না ঘটলেও পরোক্ষভাবে ঘটে থাকে। শিক্ষণের লক্ষ্য হল শিখনকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বলা যায় শিখনের লক্ষ্য হল জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটানো, দক্ষতার উন্নতি ঘটানো এবং ধারণার প্রসার ঘটানো। এক্ষেত্রে শিক্ষণের লক্ষ্য হল প্রয়োজনীয় আচরণের পরিবর্তন ঘটানো। সুতরাং শিখনের জন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি উদ্ভাবিত হয় সেগুলো হল—

(i) কে শিখবে? (অবশ্যই শিক্ষার্থী)

(ii) কীভাবে শিখবে? (শিক্ষা পদ্ধতি)

(iii) কেন শিখবে? (শিক্ষার লক্ষ্য)

(iv) কে শেখাবে? (শিক্ষক এবং পরিবেশ)

(v) কখন শিখবে? (প্রেষণার জাগরণ)

(vi) কোথায় শিখবে? (বিদ্যালয়, খেলার মাঠ ইত্যাদি।)

(vii) কী শিখবে? (জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদি।)

শিক্ষা ও শিক্ষণ : পৃথিবীতে মানুষ একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী যারা সমাজ গঠন করতে পারে। প্রকৃতিকে মানুষ নিজের মতো করে ব্যবহার করতে পারে এবং পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন রকম চিন্তাভাবনা করতে পারে।

মানব সমাজেই একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে। শিশু যত বড়ো হতে থাকে ততই সে সমাজের নিয়মকানুন, রীতি-নীতি ইত্যাদি শিখতে শুরু করে। এক্ষেত্রে মানব শিশুকে সহায়তা করে থাকে শিক্ষা। সভ্যতার অগ্রগতির পূর্বে মানুষ যখন বনে বসবাস করত তখন নিজেদের জীবন রক্ষা করার জন্য তারা পাথর দিয়ে অস্ত্র তৈরি করত। কিন্তু যত সভ্যতার উন্নতি ঘটেছে, ততই সমাজ জটিল হয়ে পড়েছে। সমাজে বিজ্ঞানের আবিষ্কার হবার ফলে যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। এর ফলে শিক্ষার বিষয় এবং পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে। মনোবিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্ব এবং পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে। মনোবিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্ব এবং ধারণা শিক্ষাকে আরো বিজ্ঞানসম্মত করে তুলেছে। শিক্ষাবিদ **এরিক আস্‌বি** শিক্ষাক্ষেত্রে চারটি বিপ্লবের স্তরের কথা বলেছেন। সেগুলি হল–

(i) প্রথম বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে যখন শিক্ষার দায়িত্ব আংশিকভাবে পিতামাতার হাত থেকে শিক্ষকদের হাতে স্থানান্তরিত হয় এবং পরিবারের হাত থেকে বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়।

(ii) শিক্ষাক্ষেত্রে লিখিত শব্দের ব্যবহার করা শুরু হবার সময় থেকেই শিক্ষায় দ্বিতীয় বিপ্লব শুরু হয়। পূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে মৌখিক ভাষার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। তবে বর্তমানে শ্রেণিকক্ষগুলিতে মৌখিক ভাষার সাথে সাথে লিখিত ভাষার ব্যবহার একই সাথে চলতে থাকে।

(iii) তৃতীয় স্তরের বিপ্লব শুরু হয় ছাপাখানার আবিষ্কারের পর থেকে। এই আবিষ্কারের ফলে পাঠ্যবই-এর ব্যবহার অনেক গুণ বেড়ে যায়।

(iv) চতুর্থ স্তরের বিপ্লব শুরু হয় শিক্ষাক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক্সের প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে। শিক্ষাক্ষেত্রে রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার এবং কম্পিউটারের ব্যবহার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

সুতরাং বলা যায় যে শিল্প, প্রযুক্তি এবং তথ্য বিপ্লবের যুগে শিক্ষণ এবং শিক্ষা এমন পারস্পরিকভাবে যুক্ত হয়েছে যে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি আলোচনা করা অসম্ভব।

শিক্ষণ ও শিখন : শিক্ষণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার কাজ হল ব্যক্তি ও সমাজের সার্বিক বিকাশ ঘটানো। সমাজে শিক্ষণ প্রক্রিয়াটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে। বর্তমানে একটি সমাজ এবং সমাজের অর্থনীতি কতটা অগ্রসর হয়েছে তা’ শিক্ষার অগ্রগতি দিয়ে বোঝা যায়। শিক্ষণ পদ্ধতির আধুনিকতার উপরই শিখন প্রক্রিয়ার প্রাগ্রসরতা নির্ভর করে।

নিজ অগ্রগতি যাচাই করুন :

১. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন —

(i) শিক্ষণ হল একটি

(a) কলা (c) কলা এবং বিজ্ঞান

(b) বিজ্ঞান (d) কোনোটি নয়

(ii) শিক্ষণ হল—

(a) দ্বিমেরু প্রক্রিয়া (c) মেরুহীন প্রক্রিয়া

(b) ত্রিমেরুবিশিষ্ট প্রক্রিয়া (d) কোনোটি নয়

(iii) শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অধীন চলরাশিটি হল—

(a) শিক্ষার্থী (c) শিক্ষণীয় বস্তু

(b) শিক্ষক (d) কোনোটি নয়

২. দু-একটি বাক্যে উত্তর দিন (অনধিক ৩০টি শব্দ)

(i) শিক্ষণের একটি কার্যকরী সংজ্ঞা দিন।

(ii) শিক্ষণের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

(iii) শিক্ষণের Phase গুলি কী কী ?

৩. সংক্ষেপে উত্তর দিন— (অনধিক ২৫০টি শব্দ)

(i) কার্যকর শিক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

শিখনের ফলাফল

উপএককটি অধ্যয়ন করে শিক্ষক-শিক্ষার্থী

১। শিক্ষণের অর্থ এবং প্রকৃতি বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন।

২। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের সহায়ক হবেন।

৩। শিখন এবং শিক্ষণের বৈশিষ্ট্যাবলি বুঝতে সমর্থ হবেন।

৩.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

অতীত অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ এবং পরিবেশের প্রভাবে আচরণের পরিবর্তন ঘটিয়ে পরিবর্তনশীল পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার প্রক্রিয়া হল শিখন। অন্যদিকে শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতাকে পর্যালোচনা করে, তার কীরূপ আচরণ কাম্য তা নির্ধারণ করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া হল শিক্ষণ। শিখন ফলশ্রুতির নিরিখে শিক্ষণ কার্যকারিতা বিচার করা হয়। অর্থাৎ শিখন ও শিক্ষণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিখন পরিস্থিতি এবং আচরণ অনুযায়ী শিখনকে জ্ঞানমূলক ও দক্ষতামূলক এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। কোন কোন পরিস্থিতিতে কোন কোন ধরনের আচরণের পরিবর্তন হয় তার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার শিখন পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিখন পদ্ধতির ব্যাখ্যা দান করেছেন। শিখন, শিক্ষার্থী ও শিক্ষণ প্রত্যক্ষভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।

৩.৭ অনুশীলনী (Exercise)

১. শিখনের ধারণাটি ব্যক্ত করুন।

২. শিখনের প্রকৃতি আলোচনা করুন।

৩. শিখনের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতার ভূমিকা আলোচনা করুন।

৪. উদাহরণসহ শিখনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৫. শিখনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কীভাবে শ্রেণি শিখনে প্রয়োগ করবে, আলোচনা করুন।

৬. শিক্ষণ কী? শিক্ষণের সাথে শিখন ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কীভাবে স্থাপন করা সম্ভব আলোচনা করুন।

৩.৮ তথ্যের উৎস (Reference)

১. Chakraborty, P.K. (2008). *Outlines of Educational Psychology*. Kolkata, India : K. Chakraborty publications.

২. *National Curriculum Framework 2005 (Habitat and Learning)*. (1st Ed.) (2006). New Delhi, India : Author.

৩. https ://en.wikipedia.org/wiki/Learning retrieved on 13.02.2016.

৪. শিখনে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি — ড. সনৎ কুমার ঘোষ — ক্লাসিক্

৫. শিক্ষায় মনোবিদ্যা — সমীররঞ্জন অধিকারী — ক্লাসিক্

৬. শিক্ষা নির্দেশনার মনস্তত্ত্ব — দুলাল মুখোপাধ্যায় ও সনৎকুমার ঘোষ — পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

৩.৯ পরবর্তী পঠন (Further Reading)

১. Mangal, S.K. (2002). *Advanced Educational Psychology*, Delhi, India : PHI Limited.

২. Chauhan, S.S. (2009). *Advanced Educational Psychology*. Delhi, India: Vikas Publishing.

অধ্যায় ৪

জ্ঞান এবং পাঠক্রম
(Knowledge and Curriculum)

৪.১ সূচনা (Introduction)

পূর্বে মনে করা হত শিশুর মন হল Blank slate বা Tabula Rasa। এখানে যা খুশি জ্ঞান ভরে দেওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদগণ মনে করেন শিশু নিজে নিজেই সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নতুন জ্ঞান নির্মাণ করে। এক্ষেত্রে অবশ্যই পূর্বজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। এই অধ্যায়ে আমরা শিশুর জ্ঞাননির্মাণ, পাঠক্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

৪.২ শিশুর জ্ঞান নির্মাণ : সক্রিয়তা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান নির্মাণ (Child construction of knowledge : attaining knowledge through activity and experience)

উদ্দেশ্য : জ্ঞান নির্মাণের বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পারা।

সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান নির্মাণ :

সাধারণভাবে শিশু তার চারপাশের প্রকৃতি, পরিবেশের সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এর জন্য অবশ্যই সক্রিয়তার প্রয়োজন। এই অভিজ্ঞতাগুলিই নতুন জ্ঞান হিসেবে পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সংযোজিত হয়।

জন ডিউই শিখনে অভিজ্ঞতার ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

নির্মিতিবাদী মনোবিদগণ বলেন, ব্যক্তি সক্রিয়তার মাধ্যমে জ্ঞান নির্মাণ করে। এটি অংশ হিসেবে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নির্মিত হয়। শিক্ষক এখন আর জ্ঞান সরবরাহের কাজ করেন না।

শিক্ষার্থী বিভিন্ন উৎস থেকে জ্ঞান আহরণ করে। যেমন বিভিন্ন বই, ই-তথ্য, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি। এই জ্ঞান পারস্পরিক আদান-প্রদানের দ্বারা বৃদ্ধি পায়, উৎকর্ষতা লাভ করে।

সক্রিয়তা বা Activity শিশুর মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন ঘটায়, শিশুর শিখন হয়। আমরা বলি শিশু কিছু শিখেছে।

সক্রিয়তা এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা যে জ্ঞান শিশু নির্মাণ করে তা চিরস্থায়ী হয়।

বর্তমানে শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয়ভাবে শিক্ষকের কাছ থেকে সবকিছু 'ইনপুট' গ্রহণ করে না। সে সক্রিয়ভাবে অর্থ বোঝার চেষ্টা করে। বিষয়ের অর্থ তার কাছে স্পষ্ট হলে তবেই সে তা গ্রহণ করে। আলোচ্য বিষয় ইতিপূর্বে শেখা বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করে।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান কীভাবে নির্মাণ করা যায় তার কয়েকটি উদাহরণ দিন। স্কুলপাঠ্য বিষয় থেকে উদাহরণ নেবেন।

শিখনের ফলাফল :

শিক্ষার্থী জ্ঞান নির্মাণের ক্ষেত্রে সক্রিয়তা এবং অভিজ্ঞতার গুরুত্ব সম্বন্ধে জানবে।

৪.৩ পাঠক্রমের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ (Definition of Curriculum and Types of Curriculum)

উদ্দেশ্য : ১) পাঠক্রমের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা, এর প্রকৃতি ও প্রকার সম্বন্ধে জানা।

২) পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারা।

৩) বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠক্রমের সমন্বয়সাধন করা।

পাঠক্রমের সংজ্ঞা

পাঠক্রম শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল নির্দিষ্ট শিক্ষাগত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যাত্রার নির্দিষ্ট পথ। শিক্ষাক্ষেত্রে এর অর্থ হল পঠনপাঠন ও শিক্ষাসম্পর্কিত অন্যান্য কাজের জন্য নির্দিষ্ট পথ। বিভিন্ন শিক্ষাবিদগণ পাঠক্রমের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—

Good-এর মতে, কোনো পেশায় প্রবেশের যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যে শংসাপত্র দেওয়া হয় তার অন্তর্গত সমস্ত বিষয় এবং পাঠদানের যাবতীয় ব্যবস্থাকে পাঠক্রম বলে।

Crow & Crow-এর মতে, শিক্ষার্থীর মানসিক, দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ও বাইরে পরিকল্পিত সকল কর্মসূচি এবং অভিজ্ঞতার সমন্বয় হল পাঠক্রম।

Ross-এর মতে, Curriculum includes cognitive, affective and psychomotor activities. অর্থাৎ পাঠক্রমের মধ্যে বৌদ্ধিক, অনুভূতিমূলক এবং মনঃসঞ্চালনমূলক কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেছেন, ‘‘পাঠক্রম বলতে কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে গতানুগতিক বিষয়ের শিক্ষাকে বোঝায় না। এর দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকে বোঝায়। এই অভিজ্ঞতা শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, পরীক্ষাগার, ওয়ার্কশপ, খেলার মাঠ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগৃহীত হতে পারে।”

এইসব সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, পাঠক্রমের মূল বিষয় হল— পাঠক্রমের পরিধি বিস্তৃত, এটি শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ, পরিবেশ সবকিছুই বিবেচনা করে। শিক্ষাকালীন সমস্ত জীবনই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। পাঠক্রম শিক্ষার্থীকে একটি সুষম ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে সাহায্য করে। কোনো পাঠক্রম তখনই সফল হবে, যদি তার দ্বারা শিক্ষার্থীর নিজের, সমাজের এবং জাতীয় জীবনের উন্নতি ঘটে।

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, মূল্যায়ন এই চারটি উপাদানের সমন্বয়ে যে কর্মসূচি রচিত হয় তাই পাঠক্রম।

Curriculum is an integrated system of elements and espects of education like objectives, contents, methods and evaluation programmes.

● পাঠক্রমের গতানুগতিক ধারণা এবং আধুনিক ধারণার মধ্যে পার্থক্য :

গতানুগতিক ধারণা	আধুনিক ধারণা
১. লক্ষ্য হল সংকীর্ণ।	১. লক্ষ্য হল বিস্তৃত।
২. শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ সম্ভব নয়।	২. ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ সম্ভব।
৩. পাঠক্রমে স্থিতিশীলতা থাকে ও বৈচিত্র্যের অভাব দেখা যায়।	৩. পাঠক্রম গতিশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ।
৪. পাঠক্রমের বিষয় প্রধানত জ্ঞানমূলক।	৪. জ্ঞানমূলক বিষয়ের সাথে অনুভূতিমূলক এবং মনঃশ্চালকমূলক অভিজ্ঞতাও অন্তর্ভুক্ত।
৫. শিক্ষার্থীদের একঘেয়েমি আসে।	৫. শিক্ষার্থীদের একঘেয়েমি দূর করা সম্ভব।
৬. সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির প্রতি গুরুত্ব নেই।	৬. সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
৭. এই ধরনের পাঠক্রমের মূলভিত্তি হল মানসিক শৃঙ্খলাবাদ।	৭. এই ধরনের পাঠক্রম মনোবৈজ্ঞানিক, সমাজবৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

পাঠক্রমের প্রকারভেদ

প্রকৃতিভেদে পাঠক্রম দু'প্রকারের —

(১) লুক্কায়িত পাঠক্রম। (Hidden Curriculum)

(২) ব্যক্ত পাঠক্রম। (Explicit or written Curriculum)

(১) **লুক্কায়িত পাঠক্রম—** শ্রেণিকক্ষে পূর্বপরিকল্পিত নয় এমন অনেক কিছু সংঘটিত হয়। পাঠক্রমের পরিকল্পনায় এগুলির উল্লেখ নাও থাকতে পারে। এগুলিকেই লুক্কায়িত পাঠক্রম বলে। যেমন— শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নকরণে উৎসাহিত করা, বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কের অবতারণা করা, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক প্রবেশ করলে উঠে দাঁড়ানো, বিদ্যালয়ে পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি লুক্কায়িত পাঠক্রমের অন্তর্গত।

(২) **ব্যক্ত পাঠক্রম—** যে পাঠক্রম লিখিত আকারে থাকে তাই ব্যক্ত পাঠক্রম। এই পাঠক্রম পরিকল্পিত এবং নিয়ন্ত্রিত। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে, বিষয়বস্তু, নির্বাচন করে শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন করে, বিজ্ঞানভিত্তিক কৌশলে তা শিক্ষার্থীদের উপর প্রয়োগ করে মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্জিত শিখন সামর্থ্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে প্রয়োজনমত সংযোজন, বিয়োজন এবং সংশোধন এবং পুনঃপ্রয়োগ করা হয়। এগুলিই ব্যক্ত পাঠক্রম। এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।

● **ব্যক্ত পাঠক্রম বিভিন্ন প্রকারের হয় :**

(ক) বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম (Subject centered curriculum)

(খ) কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম (Activity curriculum)

(গ) অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম (Experience curriculum)

(ঘ) কেন্দ্রীয় বা অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম (Core or integrated curriculum)

(ঙ) জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম (Life centered curriculum)

(ক) বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম—

এই পাঠক্রমকে গতানুগতিক পাঠক্রমও বলা হয়। এখানে বিভিন্ন প্রথাগত পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির মতো কতগুলি বিষয়ের শুদ্ধ তাত্ত্বিক জ্ঞান শিক্ষার্থীকে সরবরাহ করার জন্য এই রকম পাঠক্রম রচিত হত। এটি মানসিক শৃঙ্খলতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি বিষয় অধ্যয়নের দ্বারা মনের বিভিন্ন ক্ষমতা জটিল চিন্তন বিকাশলাভ করে। যেমন— গণিত যুক্তিশক্তি বিকাশে, ইতিহাস স্মৃতিশক্তি বিকাশে, সাহিত্য চিন্তাশক্তি বিকাশে, বিজ্ঞান যুক্তিশক্তি ও সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করে।

এই পাঠক্রমের অসুবিধা সমূহ :

(১) **জ্ঞানের বিচ্ছিন্নতা—** প্রত্যেকটি বিষয়কে এক একটি পাঠ্যবিষয় হিসাবে ধরা হয়। শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের সমন্বয়ের কোনো অবকাশ পায় না।

(২) **অপরিবর্তনীয়—** এখানে পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার কোনো বিকাশ হয় না।

(৩) **অমনোবৈজ্ঞানিক—** শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা ও পরিণমন স্তরের কথা বিবেচনা করা হয় না। পাঠক্রমের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে সবসময় গ্রহণযোগ্য হয় না।

(৪) **সামাজিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্নতা—** প্রথাগত বিষয় শিক্ষার্থীর সামাজিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে না। ফলে শিক্ষার্থীর সামজিক বিকাশ হয় না।

(৫) **ব্যবহারিক মূল্যহীনতা—** পরীক্ষা পাসের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার ব্যবহারিক দিক অবহেলিত হয়।

(৬) **আনন্দহীনতা—** শিক্ষার পরিবেশ আনন্দজনক হয় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, এই ধরনের পাঠক্রম যান্ত্রিকভাবে রচিত হয়, এগুলো মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন দিকের সামুদায়িক বিকাশ হয় না।

(খ) কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম—

এই পাঠক্রমের মৌলিক উপাদান হল শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা। পাঠক্রমের মূল কথা হল শিক্ষণীয় বিষয়কে প্রত্যক্ষ কাজের সঙ্গে যুক্ত করা।

জন ডিউই-র মতে, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা ও আগ্রহ থেকে উৎপন্ন কতগুলো ধারাবাহিক কর্মপ্রবাহই হল কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম।

শিক্ষাবিদ ব্রানফোর্ড বলেছেন, কাজের মাধ্যমে ব্যক্তির কর্মেন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক এবং অন্তরের বিকাশ হয়। তিনি এর নাম দিয়েছেন,

Education of 3H's বা তিনটি 'H' -এর শিক্ষা। (Hand, Head and Heart)

এই ধরনের পাঠক্রমের জন্য নির্বাচিত কাজের বৈশিষ্ট্য—

(১) শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সহায়ক হবে।

(২) কাজগুলি যেন শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশেও সাহায্য করে।

(৩) কাজগুলো শিক্ষামূলক হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের সাংগঠনিক রূপ :

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম

দৈহিক কাজ	পরিবেশগত কাজ	গঠনমূলক কাজ	সৃজনাত্মক কাজ	কল্পনাত্মক কাজ	সামাজিক কাজ
শারীর শিক্ষা, খেলাধুলা, স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত কাজ, Action song	Nature Study, ভ্রমণ, সমীক্ষা, সমাজ পরিদর্শন	হাতের কাজ, গঠনমূলক হস্তশিল্প, যন্ত্রপাতি সারানো	সঙ্গীত, শিল্পকলা	সাহিত্য পাঠ, অভিনয়, প্রবন্ধ রচনা, কল্পনাভিত্তিক অঙ্কন	সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ, বিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন, প্রাথমিক চিকিৎসা, সমাজসেবা

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের উপযোগিতা :

(১) শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশে সহায়তা করে।

(২) এটি মনোবিজ্ঞানসম্মত।

(৩) শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠনের সুষ্ঠু বিকাশে সহায়তা করে।

(৪) শিক্ষার্থীর প্রাক্ষোভিক বিকাশের উদ্দেশ্য সফল করতে সহায়তা করে।

(৫) শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের অসুবিধা সমূহ :

(১) কাজের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য থেকে শিক্ষার্থীর মনোযোগ অন্যদিকে চলে যায়।

(২) অনেক সময় লাগে। শিক্ষার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

(৩) উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন।

(৪) বিমূর্ত চিন্তনের উপর তেমন জোর দেওয়া হয় না।

(গ) অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম —

শিক্ষার্থীদের চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উদ্দেশ্যমুখী কতগুলো অভিজ্ঞতার সমন্বয় হল অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম। এই ধরনের পাঠক্রমের উপাদান হল কতকগুলো অভিজ্ঞতা, যা শিক্ষার্থীকে আরও অভিজ্ঞতা অর্জনে ও নতুন সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে।

এই জাতীয় পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য :

(১) অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমের উপাদান হল শিক্ষার্থীর জন্য কতগুলি নির্বাচিত অভিজ্ঞতা।

(২) অভিজ্ঞতাগুলি একটি নির্দিষ্টক্রমে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৩) অভিজ্ঞতাগুলি কোনো বিক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কতগুলি অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটে।

(৪) অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুসারে নির্বাচন করা হয়।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমের উপযোগিতা :

(১) এই ধরনের পাঠক্রম মনোবিজ্ঞানসম্মত।

(২) এই পাঠক্রম অনুসরণের ফলে শিক্ষকের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়।

(৩) শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশ ঘটে।

(৪) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার নৈতিক মানের উন্নতি ঘটে।

(৫) শিক্ষার কাজ পরিচালনা করা সহজ হয়।

(৬) শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমের অসুবিধা সমূহ :

(১) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে অনেক সময় লাগে। শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

(২) এখানে শিক্ষক, শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাই মুখ্য। সক্রিয়তার সাথে স্বাধীনতাও থাকে। খুব বেশি স্বাধীনতা শিক্ষার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় বা অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম—

গতানুগতিক পাঠক্রমের পাঠ্যবিষয়গুলি বিচ্ছিন্নভাবে সন্নিবেশিত থাকে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য আধুনিক ধারণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম বা কেন্দ্রীয় পাঠক্রমের সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষাবিদ N.L. Bossing-এর মতে 'অবিচ্ছিন্ন কেন্দ্রীয় পাঠক্রম হল কতগুলি প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচিত অভিজ্ঞতার সমবায়, যা শিক্ষার্থীকে ঐসব জ্ঞানের বিস্তৃতক্ষেত্র সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিতে পারে।'

এই ধরনের পাঠক্রমে অভিজ্ঞতাগুলিকে এমনভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে আদর্শ অভ্যাস (Habit) কর্মদক্ষতা (Skill) এবং জীবনাদর্শ (Life ideal) গড়ে ওঠে।

অনেক শিক্ষাবিদদের মতে, 'The undifferentiated or core-curriculum is that which does not lead to specialization'.

কেন্দ্রীয় পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য :

(১) এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সমন্বয়। চিন্তাবিদ হার্বার্ট-এর মতে জ্ঞানের উৎস এক, মানুষের মন ঐক্যধর্মী। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন এবং একই বিষয়ের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

(২) শিক্ষার্থীর মনে বহুমুখী আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে এই ধরনের পাঠক্রম। কারণ এখানে বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার সমাবেশ করা হয়।

(৩) শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে লাগে এমন অভিজ্ঞতা এখানে নির্বাচন করা হয়।

1986-র জাতীয় শিক্ষানীতিতে এই ধরনের পাঠক্রম রচনার কথা বলা হয়েছে।

(৪) শিক্ষার্থীকে সামাজিক জীবনযাপনের উপযুক্ত করে তোলা যায়। এই ধরনের পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশের প্রতি গুরুত্ব দেয়।

(৫) এটি প্রস্তুতিমূলক পাঠক্রম। শিক্ষার পরবর্তী স্তরে বিশেষধর্মী পাঠক্রমের জন্য শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে।

কেন্দ্রীয় পাঠক্রমের উপযোগিতা :

(১) এই পাঠক্রমে যেহেতু বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের তথ্যকে মূল ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, সেহেতু এখানে জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি ঘটে না। শিক্ষক/শিক্ষার্থীর শ্রম লাঘব হয়।

(২) সমাজের সকল সদস্যের সাধারণ প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে পাঠক্রম রচিত হয়।

(৩) শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা সংরক্ষণে সাহায্য করে।

(৪) এই পাঠক্রম প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই কার্যকর করা যায়।

(৫) শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশেষধর্মী শিক্ষার প্রস্তুতি রচনা করে।

কেন্দ্রীয় পাঠক্রমের অসুবিধাসমূহ :

(১) সব বিষয়ের সবক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন সম্ভব হয় না।

(২) অনেক সময় এমন সমন্বয় ঘটানো হয় যা বাস্তব নয়। ফলে শিক্ষার্থীর মনে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

(৩) শিক্ষার্থীর মন সমন্বয়ধর্মী হলেও, সে আরোপিত সমন্বয়কে গ্রহণ করতে পারে না।

(ঙ) জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম—

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ। এর মধ্যে সামাজিক বিকাশও অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থীর অনুরাগ, আকাঙ্খা ও চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষার পাঠক্রম রচনা করতে হয়।

জীবনের জন্য শিক্ষা, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার সমন্বয়ে এই ধরনের পাঠক্রম রচিত হয়।

এই ধরনের পাঠক্রমের মধ্যে শিক্ষার্থীর জীবন প্রক্রিয়া ও জীবন পদ্ধতি উভয়েরই স্থান থাকে।

জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য :

(১) পাঠক্রমের উপাদান শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী নেওয়া হয়।

(২) এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

(৩) পাঠক্রমকে শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের উপযোগী হতে হয়।

(৪) শিক্ষার্থীকে সামাজিক অভিযোজনে সহায়তা করে।

(৫) এই ধরনের পাঠক্রম সামাজিক চাহিদা পূরণে সক্ষম।

পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যে পার্থক্য—

পাঠক্রম (Curriculum)	পাঠ্যসূচি (Syllabus)
১. পাঠক্রমের ধারণা ব্যাপক, বিস্তৃত।	১. পাঠ্যসূচির ধারণা সংকীর্ণ।
২. পাঠক্রম পুস্তক-নির্ভর নয়। শ্রেণিকক্ষ, শ্রেণিকক্ষের বাইরের অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির সবই পাঠক্রমের অন্তর্গত।	২. পাঠ্যসূচি পুস্তকনির্ভর।
৩. শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।	৩. শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের উপর এবং স্মৃতিশক্তির উপর জোর দেওয়া হয়।

পরিশেষে বলা যায়,

পাঠক্রম হল পাঠ্যসূচি, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি, পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়া ইত্যাদির সমষ্টি।

- **বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের পাঠক্রমের সমন্বয় ঘটানো—**

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থী থাকে। তাদের দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক বিকাশের স্তর বিভিন্ন। তাছাড়া একই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্যও থাকে।

তাই পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে এইসব বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হয়। যে পরিস্থিতিতে, পরিণমনের যে স্তরে যে ধরনের পাঠক্রমের প্রয়োজন সেখানে সেই ধরনের পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

যেমন বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রের সম্পর্ক বেশি, তাই এইসব বিষয়ে তত্ত্বের পাশাপাশি ব্যবহারিক অংশও সংযোজিত হওয়া প্রয়োজন।

ইতিহাসের ক্ষেত্রে পাথুরে প্রমাণ বা আকর সূত্রের সন্নিবেশ প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থী ইতিহাসের তথ্যগুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপলব্ধি করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, বিদ্যালয় স্তরে পাঠক্রম এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীর ভাষার বিকাশ হয়, সামাজিক বিকাশ হয়। সে জীবনে চলার পথে একজন যোগ্য, সফল সদস্য হিসেবে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

(১) পাঠক্রমের সংজ্ঞা দিন।

(২) পাঠক্রমের আধুনিক ধারণার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

(৩) লুক্কায়িত পাঠক্রম কী?

(৪) বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম বলতে কী বোঝেন? এর ত্রুটিগুলি কী কী?

(৫) কেন্দ্রীয় পাঠক্রমকে অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম বলা হয় কেন?

(৬) জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম কী? এর সুবিধাগুলি কী কী?

(৭) পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যে পার্থক্য কী?

শিখনের ফলাফল :

(১) শিক্ষার্থীরা পাঠক্রমের প্রকৃতি ও ধারণা সম্বন্ধে জানবে।

(২) বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠক্রমের সমন্বয় প্রয়োগ করতে পারবে।

৪.৪ পাঠক্রমের উপাদানসমূহ (Factors of Curriculum)

উদ্দেশ্য :

(১) পাঠক্রমের উপাদান সম্বন্ধে বোধ জন্মানো।

(২) পাঠক্রমের উপাদানের প্রকৃতি অনুধাবন করা।

৩) শিক্ষার্থীর চাহিদাপূরণ কীভাবে করা যায় তা বোঝা।

- **পাঠক্রমের উপাদান—**

কোনো পাঠক্রম রচনার সময় যে বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয় তাই হল পাঠক্রমের উপাদান। যেমন— বিষয়ের প্রকৃতি, বিকাশমূলক বিষয়, পারিপার্শ্বিক ও অর্থনৈতিক বিষয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়, শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়, প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিষয় ইত্যাদি।

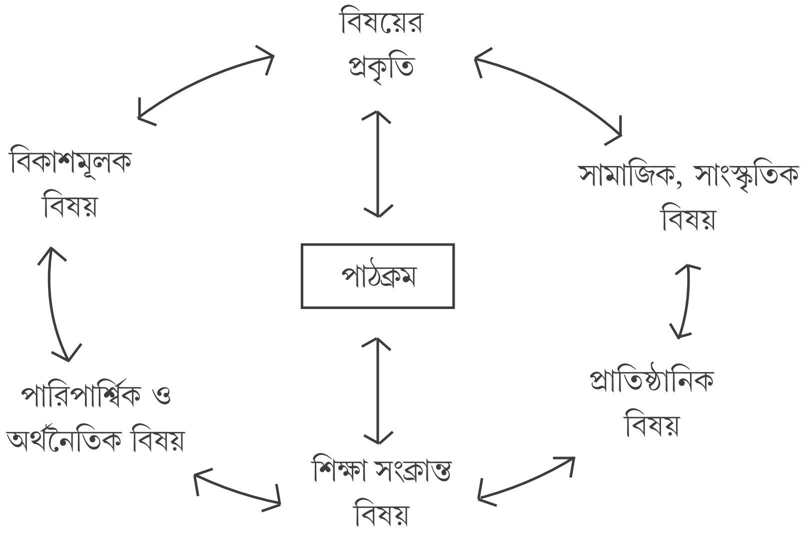

পাঠক্রমের উপাদান

এখানে চিত্রে লক্ষ্যণীয়, প্রত্যেক উপাদানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটে।

উপাদানগুলি সম্বন্ধে নিম্নে বিশদে আলোচনা করা হল।

(১) **বিষয়ের প্রকৃতি—** এখানে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন— সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, পরিবেশ ইত্যাদি।

(২) **বিকাশমূলক বিষয়—** শিক্ষার্থীর বিকাশ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্যসংগ্রহ করতে হয়। যেমন— পাঠক্রমের স্তর, শিক্ষার্থীর পরিণমনের স্তর, তাদের সামর্থ্য, আগ্রহ ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর বিকাশের বিভিন্ন স্তর— দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক বিকাশের তথ্যগুলি সন্নিবিষ্ট করতে হয়।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিষয়—

শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল সামাজিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সঞ্চালিত করা। পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিষয় প্রভাব বিস্তার করে। পাঠক্রম এমন হওয়া উচিত যাতে তা স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় স্তরে কার্যকরী হয়।

(পরিবেশগত) পারিপার্শ্বিক ও অর্থনৈতিক বিষয়—

পাঠক্রমের কার্যকারিতা অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে যেমন সমাজ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক সকলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তেমনি আর্থিক বিষয়ও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ ছাড়া সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আর্থিক উপাদানকে চারটি দিক থেকে বিবেচনা করতে হয়।

(ক) প্রাথমিক ব্যয়।

(খ) রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয়।

(গ) পরিপূরক ব্যয়।

(ঘ) ব্যক্তিগত ব্যয়।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়—

পাঠক্রম রচয়িতাদের শিক্ষার আধুনিক ধারণার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। নতুন পদ্ধতি (শিক্ষণ এবং শিখন উভয়ই), অভীক্ষা, মূল্যায়ন, পুনঃপরিকল্পনা, পুনঃপ্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়—

প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, তার কার্যকরী দিকের প্রতি পাঠক্রম রচয়িতাগণ অবহিত হবেন। কারণ সমাজ তার চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেয়।

শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ :

পাঠক্রমের উপাদানগুলি ঠিকমতো সন্নিবেশিত হলে শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

শিক্ষার্থী কোনো নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে যাতে সহজে নিজেকে অভিযোজিত করতে পারে পাঠক্রমে সেইরকম উপাদানগুলির সমন্বয় করার দরকার।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

(১) কোনো পাঠক্রমের উপাদানগুলি কী কী?

(২) পাঠক্রমের উপাদানগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

শিখনের ফলাফল :

(১) পাঠক্রমের উপাদানগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানবেন।

(২) পাঠক্রমের উপাদানের প্রকৃতি সম্বন্ধে জানবেন।

(৩) শিক্ষার্থীর অভিযোজনের জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।

৪.৫ শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার চাহিদা এবং ক্ষমতা (Purpose of Education, Needs and Abilities of Education)

উদ্দেশ্য : (১) শিক্ষার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা।

(২) শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা।

(৩) শিক্ষার চাহিদা ও ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা গঠন করা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য —

একটি প্রচলিত কথা আছে— Education elevates an animal to human being. শিক্ষা যদি না থাকত তাহলে পশুপাখির সাথে মানুষের কোনো পার্থক্য থাকত না। সমাজ তার অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতির জন্য, কল্যাণের জন্য, শান্তির জন্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। শিক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য হল সামাজিক চাহিদা পূরণ। আন্তর্জাতিক শিক্ষা

সম্মেলন (জেনেভা ২০০১) শিক্ষার কয়েকটি উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করেছে। সেগুলি হল—

(১) শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশ—

শিক্ষার্থীর মধ্যে জন্মগত যেসব দৈহিক বৈশিষ্ট্য, সম্ভাবনা আছে তার বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থী যাতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় তা দেখাও শিক্ষার উদ্দেশ্য।

(২) শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ—

শিক্ষার্থীর সুস্থ মানসিক বিকাশ শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য।

এখানে কিছু মানসিক বৈশিষ্ট্য জন্মসূত্রে প্রাপ্ত, এবং কিছু অর্জিত।

(৩) জ্ঞান অর্জন —

শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য হল বিষয়ভুক্ত জ্ঞান অর্জন করা।

এই জ্ঞান শুধু বিষয়গত বই-এর জ্ঞান নয়, পর্যবেক্ষণের দ্বারা পরিবেশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়কে জানার জ্ঞান আহরণ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

(৪) অভিযোজনের শিক্ষা—

শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক, প্রাকৃতিক পরিবেশে যাতে নিজেকে মানিয়ে চলতে পারে তাই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য।

(৫) শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশ—

জন ডিউই বলেছেন— "Education is the fundamental method of social progress and reform.".

শিক্ষা হল সামাজিক অগ্রগতি এবং উন্নয়নের উপায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থী যাতে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয় এবং সেগুলি সমাধানের পন্থা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারে সেইভাবে তাকে গড়ে তোলা।

(৬) অর্থনৈতিক বিকাশ—

আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা।

(৭) একত্রে বসবাসের শিক্ষা—

সমাজে মিলেমিশে একত্রে বাঁচার আনন্দ উপভোগ করাই মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এর জন্য প্রয়োজন সকলের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা, আন্তরিকতা, সহনশীলতা, ঐক্য, সহযোগিতা ভ্রাতৃত্ববোধ সর্বোপরি সমাজের প্রতি ভালোবাসা।

এইজন্য জ্যাক ডেলার শিক্ষার চারটি স্তম্ভের মধ্যে একত্রে বসবাসের শিক্ষাকে স্থান দিয়েছেন।

(৮) কাজ করার দক্ষতা অর্জন—

শিক্ষা শিক্ষার্থীকে কর্মদক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে। অর্জিত জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে তোলা যায়। তার দ্বারা সমাজের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

(৯) প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি—

আধুনিক শিক্ষার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে 'প্রকৃত মানুষ' হয়ে উঠতে সাহায্য করা। বর্তমান বিশ্বে 'প্রকৃত মানুষ' সত্যিই খুব কম।

❑ শিক্ষার চাহিদা এবং ক্ষমতা—

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চাহিদা। শিক্ষা এক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। শিক্ষা একদিকে মানুষের চাহিদার কারণ হয়ে উঠেছে আবার সেই চাহিদা পূরণে পথ দেখাচ্ছে।

এই চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা জরুরি। শিক্ষা যদি বেকারত্ব সৃষ্টি করে তাহলে তা মানুষের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ বলে বিবেচিত হবে। শিক্ষা তার সামাজিক গুরুত্ব হারাবে।

বর্তমানে আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বাস করছি। এই যুগে জনসাধারণের উন্নতি, কল্যাণসাধন ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে পারে শিক্ষা।

শিক্ষা মানুষ ও তার প্রকৃতি পরিবেশের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন জ্ঞান, অভিজ্ঞতাকে একত্র করে তার বর্গীকরণ করেছে, সেগুলিকে সংরক্ষণ করেছে; নিরন্তর গবেষণার মধ্যে দিয়ে জ্ঞান, অভিজ্ঞতাকে উন্নত করেছে। বিষয়, পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এখন শিক্ষার্থীর চারপাশে তথ্যের সমুদ্র।

শিক্ষার চাহিদা এই যে শিক্ষার্থীরা মূল্যবোধের শিক্ষা গ্রহণ করুক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শিক্ষা গ্রহণ করুক, শান্তির শিক্ষা, ঐক্যের শিক্ষা গ্রহণ করুক।

শিক্ষা চায় মানুষের তথা সমাজের স্থায়ী উন্নয়ন (Sustainable development)। উন্নততর জীবনযাপনে যাতে মানুষ সক্ষম হয় তাই শিক্ষার চাহিদা। শিক্ষা চায় একজন প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলতে।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের এই বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য—

"... It is education that determines the level of prosperity, welfare and security of people."

শিক্ষার ক্ষমতা —

"Education is the manifestation of perfection already in man."

শিশু জন্মসূত্রে কিছু সম্ভাবনা নিয়ে আসে। একমাত্র পরিকল্পিত কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে এইসব সম্ভাবনার স্ফূরণ সম্ভব। এই কর্মসূচিকেই শিক্ষা বলা হয়। অর্থাৎ, শিশুর সার্বিক বিকাশ ঘটাতে পারে শিক্ষা।

শিক্ষা মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণে সমর্থ।

শিক্ষা সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্য পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সঞ্চালিত করা শিক্ষার দ্বারা সম্ভব। সমাজে মানুষের কিছু গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল— জ্ঞানার্জনের চাহিদা, কৌতূহলের চাহিদা, সাফল্যের চাহিদা, আত্মবিশ্বাসের চাহিদা। শিক্ষার ক্ষমতা আছে এই সবকটি চাহিদা পূরণ করার।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

(১) শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

(২) শিক্ষার চাহিদা এবং ক্ষমতা কী কী?

শিখনের ফলাফল :

(১) শিক্ষার্থী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবে।

(২) শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।

(৩) শিক্ষার চাহিদা ও ক্ষমতা অনুধাবন করতে পারবে।

৪.৬ সংক্ষিপ্তসার (Summary)

- সক্রিয়তা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান নির্মাণ করা যায়।
- পাঠক্রম হল পঠনপাঠন ও শিক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য কাজের নির্দিষ্ট পথ।
- পাঠক্রমের আধুনিক ধারণা হল পাঠক্রমের দ্বারা ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ সম্ভব।
- ব্যক্ত বা লিখিত পাঠক্রম কয়েক প্রকারের—
  - (১) বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম
  - (২) কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম
  - (৩) অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম
  - (৪) কেন্দ্রীয় বা অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম
  - (৫) জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম
- পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সক্ষম, পাঠ্যসূচি শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ ও স্মৃতিশক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে।
- পাঠক্রমের উপাদানগুলি হল— বিষয়ের প্রকৃতি, শিক্ষার্থীর বিকাশমূলক বিষয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিষয়, প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়, শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়, পারিপার্শ্বিক ও অর্থনৈতিক বিষয়।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য হল— শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, জ্ঞান অর্জন, অভিযোজনের শিক্ষা, শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশ, আর্থিক বিকাশ, একত্র বসবাসের শিক্ষা, কাজ করার দক্ষতা অর্জন, প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি।
- শিশুর সার্বিক বিকাশ ঘটাতে পারে শিক্ষা।

৪.৭ অনুশীলনী (Exercise)

1. **সঠিক উত্তরটিতে ✓ চিহ্ন দিন :**

A. শিশুর জ্ঞান নির্মাণ নিয়ন্ত্রিত হয়

(ক) শিক্ষকের দ্বারা　(খ) শিশুর দ্বারা

(গ) পরিবেশের দ্বারা　(ঘ) উপরের সবগুলি

B. পাঠক্রম হল

(ক) শিক্ষার কৌশল　(খ) শিখনের উপায়

(গ) শিক্ষণের উপাদান　(ঘ) শিক্ষার উপাদান

C. পাঠক্রমের উপাদান হল—

(ক) বিষয়ের প্রকৃতি　(খ) শিক্ষার্থীর বিকাশ

(গ) সামাজিক সংস্কৃতি　(ঘ) উপরের সবগুলি

D. শিক্ষার ক্ষমতা হল—

(ক) জৈবিক চাহিদাপূরণ　(খ) সামাজিক চাহিদাপূরণ

(গ) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও সংস্কার　(ঘ) উপরের সবগুলি

2. a. শিক্ষার্থী কীভাবে জ্ঞান নির্মাণ করে?

   b. পাঠক্রমের মূল বিষয়গুলি কী কী?

   c. অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম বলতে কী বোঝায়?

   d. ব্যবহারিক পাঠক্রম বলতে কী বোঝায়?

3. পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যে পার্থক্য কী?

4. পাঠক্রমের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪.৮ তথ্য উৎস (Reference)

১. পাঠক্রম নীতি ও নির্মাণ — ড. প্রণব কুমার চক্রবর্তী — ক্লাসিক্ পাবলিশার্স

২. Translating the Curriculum, Multiculturalism into Cultural studies – Susan Huddleston Edgerson

৩. National Curriculum Framework – NCERT (2005)

৪. Curriculum Development – J.C. Aggarwal & S. Gupta

৫. শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন— সুশীল রায়

পরবর্তী পঠন (Further Reading)

1. শিশুর জ্ঞান নির্মাণের কৌশল ও পদ্ধতি
2. বিভিন্ন ধরনের পাঠক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের পদ্ধতি
3. পাঠক্রমের উপাদানসমূহ
4. শিক্ষার চাহিদা ও ক্ষমতা ও সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা

অধ্যায় ৫

মহান শিক্ষাবিদগণ
(Great Educators)

৫.১ সূচনা (Introduction)

দীর্ঘদিন ধরে ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং সমাজ সংস্কারকগণ নিজ নিজ চিন্তাভাবনা, দর্শন ও সমাজের সংস্কারের জন্য শিক্ষার সাহায্য নিয়েছেন। তাঁরা নিজ নিজ শিক্ষাদর্শনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজকে উন্নততর করে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা তাদের জীবনদর্শনের উপর ভিত্তি করে সমাজদর্শনও গড়ে তুলেছেন।

প্রাচ্য চিন্তাবিদগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— মহাত্মা গান্ধী, শ্রী অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ।

পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— রুশো, জন ডিউই, ফ্রয়েবেল, মাদাম মন্তেসরি, পিঁয়াজে প্রমুখ।

৫.২ ভারতীয় চিন্তাবিদগণ : গান্ধীজি, শ্রী অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ।

৫.৩ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ : রুশো, ডিউই, ফ্রয়েবেল, মন্তেসরি, পিঁয়াজে।

৫.২ ভারতীয় চিন্তাবিদগণ : গান্ধীজি, শ্রী অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ (Indian Thinkers : Gandhji, Shri Aurobido, Rabindra Nath Tagore, Vidyasagar, Swami Vivekananda)

উদ্দেশ্য :

(a) গান্ধীজির শিক্ষার দর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে জানা।

(b) বুনিয়াদি শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা।

(c) শ্রী অরবিন্দের শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে জানা।

(d) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য জানা।

(e) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা।

(f) বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার সম্পর্কে জানা।

(g) বিদ্যাসাগর ও নারী শিক্ষার বিকাশ সম্পর্কে জানা।

(h) বিদ্যাসাগরের প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ সম্পর্কে জানা।

(i) স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্পর্কে জানা।

(j) স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে জানা।

(k) স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার পাঠক্রম সম্পর্কে জানা।

মহাত্মা গান্ধী : ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব হলেন গান্ধীজি। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে এই রাজনৈতিক নেতা, সংগঠক, সমাজ সংস্কারক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের জন্ম। গান্ধীজির শিক্ষাদর্শন তাঁর ব্যাপ্ত জীবনদর্শনেরই প্রয়োগ, প্রতিফলন।

১৮৯৯ সালে ব্যারিস্টারি পাসের পর প্রতিষ্ঠিত আইনব্যবসা ত্যাগ করে ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসে দেশের মুক্তি আন্দোলনে এবং শিক্ষা প্রসারে নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি 'মহাত্মা'র মহাপ্রয়াণ ঘটে।

গান্ধীজির শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে জানা :

গান্ধীজী শিক্ষাকে সত্যান্বেষণ ও আত্মোপলব্ধির পন্থা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। শিক্ষা বলতে তিনি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত নৈতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সকল রকমের সত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশকে বুঝিয়েছেন। শিক্ষা হল ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন করা। এই লক্ষ্যকে তিনি শিক্ষার চরম লক্ষ্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি নাগরিক শিক্ষাকে অপছন্দ করতেন তবে তিনি বুঝেছিলেন শ্রমবিমুখ ভারতবাসীকে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা শ্রমের প্রতি মর্যাদা শেখাতে হবে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন এই ধরনের শিক্ষার মাধ্যমে চারিত্রিক দৃঢ়তা বাড়ানো এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করা সম্ভব। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

বুনিয়াদি শিক্ষার বৈশিষ্ট্য :

- ৭ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক।
- এই বয়সে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা না দিয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে।
- শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও স্থানীয় চাহিদার কথা মাথায় রেখে কোনো একটি নির্দিষ্ট শিল্পকে কেন্দ্র করে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হবে। যেমন— বুনন বা হাতে কাটা সুতো, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, সেলাই, কৃষি, বাগান তৈরি, মৎস্য চাষ প্রভৃতি।
- নির্দিষ্ট শিল্পকে কেন্দ্র করে অর্থ উপার্জন করবে এবং নিজেদের শিক্ষার ব্যয় নিজেরাই বহন করবে এমন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।
- গান্ধীজি অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেবার কথা বলেছেন।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য এবং নাগরিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেবার কথা বলেছেন।
- পাঠ্যপুস্তক যতটা সম্ভব পরিহার করতে হবে।
- বুনিয়াদি শিক্ষা শিশুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রাপ্তবয়স্ক, স্ত্রীলোক ও হরিজনদের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- বাহ্যিক মূল্যায়নের থেকে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে গুরুত্ব বেশি দিতে হবে।
- বুনিয়াদি শিক্ষার কাঠামোয় চারটি স্তর থাকবে। (ক) প্রাক্ বুনিয়াদি স্তর (সাত বছরের পূর্ব পর্যন্ত) (খ) জুনিয়র বেসিক স্তর (সাত থেকে দশ বছর) (গ) সিনিয়র বেসিক স্তর (এগারো থেকে চোদ্দো বছর) (ঘ) পোস্ট বেসিক স্তর (চোদ্দো বছরের পর)

  (ক) জাতির মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

  (খ) বুনিয়াদি শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও জাতির ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাপূরণ।

  (গ) সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে দণ্ডায়মান।

  (ঘ) জাতি, ধর্ম, লিঙ্গভেদে সকল ভারতবাসীর জন্য ন্যূনতম শিক্ষা।

(ঙ) শিক্ষার্থীর মৌলিক এবং সৃজনশীল সক্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত।

শ্রী অরবিন্দের শিক্ষার লক্ষ্যের প্রকাশ : (To expose aims of education of Shri Aurobindo)

শ্রী অরবিন্দ : বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী আন্দোলন এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শ্রী অরবিন্দ। একাধারে বিপ্লবী, কর্মযোগী ও শিক্ষাবিদ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭২ সালে। শ্রী অরবিন্দের জীবনাদর্শনের মূল ভিত্তি হল বেদান্ত দর্শন। তিনি তাঁর জীবন দর্শনে বিশ্বআত্মার উপলব্ধিকে মানুষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য হিসেবে নির্দেশ করেছেন। তিনি মনে করতেন, বিকাশ সহায়ক যে চেষ্টিত প্রক্রিয়া মানুষের মধ্যে সর্বশক্তিমান বিশ্ব-চেতনার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে, তাই হল শিক্ষা। ১৯৫০ সালে নির্বাণ লাভের পূর্ব পর্যন্ত জীবনের শেষ পর্বে তিনি সাধনার মধ্যে দিয়ে মানবজাতির কল্যাণের পথ অনুসন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

শ্রী অরবিন্দের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল :

(i) তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয়ী ধারণার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। শিক্ষার্থীর বিকাশই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সঠিক স্থান বা মর্যাদা দিতে হবে। তাঁর মত অনুযায়ী অন্যান্য মনীষীরাও সমন্বয়ী ধারণাকে মেনে নিয়েছেন। শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা বিস্তারে একদিকে যেমন ব্যক্তি ও সমাজকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে আত্মা এবং বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর চিন্তাধারায়, জাতির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সব বিষয়কেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি যোগ শিক্ষাকেও পাঠক্রমের অন্যতম বিষয় হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

(ii) ভাববাদ ও প্রয়োগবাদের সমন্বয়, শ্রী অরবিন্দের শিক্ষার লক্ষ্যের আর একটি বিশেষ দিক। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য হল ভাববাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এবং বন্ধন থেকে মুক্তি কিন্তু তাঁর মতে আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল প্রয়োগবাদ দ্বারা প্রভাবিত অর্থাৎ শিক্ষাই হল জীবন। শ্রী অরবিন্দের শিক্ষাচিন্তায় ভাববাদ ও প্রয়োগবাদের সমন্বয় ঘটেছে।

(iii) শ্রী অরবিন্দ মানুষের প্রকৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন স্বর্গীয় অনুভব মানুষের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। তিনি শিশুর স্বর্গীয় উপাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বর্গীয়তার বিকাশ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে।

(iv) তিনি পণ্ডিচেরীতে ১৯৫২ সালের ২৪শে এপ্রিল আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শিক্ষা চিন্তার মূল উদ্দেশ্য হল সমগ্র মানব জাতিকে একসূত্রে গাঁথা।

(v) তিনি মনে করতেন শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল মানুষের মন ও আত্মার গঠন এবং তার বিকাশ। বিদ্যালয় শিক্ষায় প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ। শরীর গঠন, চরিত্র গঠন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং গড়ার শিক্ষা। নৈতিক ও নান্দনিক বিকাশ তাঁর মতে একই সঙ্গে হওয়া উচিত।

(vi) তিনি ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণের উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তিনি বিশ্বকবি, বিশ্বপথিক, শিল্পী, সৌভ্রাতৃত্বের রূপকার, শিক্ষাবিদ ও সমগ্র ভারতবাসীর নবজীবনের দীক্ষাদাতা। শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ প্রাণের সামগ্রী, শিশু মনের ন্যায়, প্রকৃতির কাছাকাছি, বিশ্বলোকের সমীপবর্তী, আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞানমনস্কতার উদ্বোধক হিসেবে দেখেছেন। প্রকৃতিবাদী ও মানবতাবাদী এই মনীষী ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল ভিত্তি ও কাঠামোটি নিহিত আছে গীতা ও উপনিষদের মধ্যে। তিনি তাঁর শিক্ষা চিন্তায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মানুষের মূল লক্ষ্য হল মানবজীবনের

সার্থকতা। এই চরম সত্যটিকে তিনি তাঁর মহাপ্রয়াণের (১৯৪১ খ্রীঃ) পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে গড়ে তোলা তাঁর আদর্শ ক্ষেত্রকে এক স্বতন্ত্র মহিমায় উন্নীত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবনদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি হলেও মানব জীবনের সকল অভিজ্ঞতাই তাঁর শিক্ষা চিন্তায় ছোঁয়া লেগেছে। তাঁর শিক্ষাচিন্তা তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তিনি নিজেই তার প্রয়োগ করে গেছেন। তিনি নিজে একদিকে যেমন ভাববাদী চিন্তাধারার মানুষ ছিলেন অন্যদিকে তিনি প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করতেন। তাঁর মতে শিক্ষাই হল প্রকৃত শিক্ষা, যা কেবলমাত্র তথ্য পরিবেশন করে না, বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যতা রেখে জীবনকে গড়ে তোলে। তিনি গতানুগতিক শিক্ষাকে সমালোচনা করে আমাদের দেশের রীতিনীতি ও আদর্শকে স্থান দিতে হবে একথা মনে করতেন। তিনি ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সংযোগ স্থাপন করেছেন।

তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে—

(i) **বিকাশ :** তিনি বলেছেন, ''যে শিক্ষা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত ও সক্রিয় করে, আমাদের মনকে অবুদ্ধির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারে, সেই শিক্ষার দ্বারাই আমাদেরও সমস্ত দুঃখ দুর্গতির অবসান ঘটতে পারে।'' শিক্ষার্থীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করাই হল শিক্ষার লক্ষ্য।

(ii) **দৈহিক বিকাশ :** তিনি শিক্ষার্থীর দৈহিক উন্নতির দিকে বিশেষ জোর দিতে বলেছেন। তিনি বলেছেন — মুক্ত প্রকৃতিতে খেলাধুলা ও দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদির কথা।

(iii) **নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ :** তাঁর মতে সর্বব্যাপী পরম সত্তা ছায়ার মতো আমাদের সহগামী তাঁকে উপলব্ধি করাই সকল প্রকার শিক্ষার উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তিনি বলেছেন—

''আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধুলার তলে''

(iv) **সামাজিক গুণাবলির বিকাশ :** তিনি মনে করতেন — শৈশব থেকেই শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ, মানুষকে ভালোবাসা, আর্তকে সেবা করা প্রভৃতি সামাজিক গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে হবে।

(v) **জনশিক্ষা বিস্তার :** তিনি জনশিক্ষা বিস্তারের উপরও গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানবো :

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক শিক্ষা চিন্তার বিরোধিতা করে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয়। তিনি বিশ্বভারতীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটান।

তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমিক শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য হল :

(i) শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলার ও স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগ পাবে।

(ii) তিনি মনে করতেন শ্রেণিকক্ষের চার দেয়ালের মধ্যে শিক্ষার্থীদের আবদ্ধ না রেখে, খোলা আকাশের নীচে গাছের তলায় পঠন-পাঠন সবথেকে ভাল শিক্ষাব্যবস্থা।

(iii) তিনি মনে করতেন সহপাঠক্রমিক কাজ ও সৃজনমূলক কাজ বা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা পরস্পর মেলামেশা করতে পারবে। এতে শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ বিকাশ হবে।

(iv) তাঁর মতে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়তালিকা হবে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী।

(v) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধুর সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি জোর দিয়ে বলেছেন।

(vi) আশ্রমিক শিক্ষায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আর্থিক বৈষম্যকে একেবারেই গুরুত্ব না দিয়ে একই সঙ্গে পড়াশোনা, খাওয়াদাওয়া ও খেলাধুলার কথা তিনি বলেছেন।

(vii) শৈশবকাল থেকেই শিশুরা যাতে ভারতের কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজ কার্যে গর্ব অনুভব করে সেই চেষ্টা শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যায়।

(viii) তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার কথা আশ্রমিক শিক্ষায় বলেছেন।

(ix) তিনি আশ্রমিক শিক্ষা অর্থাৎ শান্তিনিকেতনে কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প, কাঠের কাজ, মাটির কাজ, চামড়ার কাজ, কৃষিকাজ ও উদ্যান পরিচর্যার শিক্ষা দেবার কথা বলেছেন।

(x) তিনি সমাজ সেবার মধ্য দিয়ে পল্লী উন্নয়নে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের কথা বলেছেন এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার কথাও বলেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : বাংলা ভাষার স্রষ্টা, শিক্ষাব্রতী ও নারী-মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২০ সালে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর জনশিক্ষা তথা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন যার মূল অংশগুলি ছিল— আদর্শ বিদ্যালয়, আদর্শ পাঠ্যপুস্তক এবং আদর্শ শিক্ষক। তাঁর রচিত'বর্ণপরিচয়' আজও বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য পুস্তক। সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থায় যুগপৎ পরিবর্তন প্রয়াসী এই মনীষীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয় ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের অকপট স্বীকারোক্তি, ''তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার মধ্যে সেতুরূপ হয়েছিলেন।"

বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার :

সমাজ সংস্কারক হিসাবে বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ বা প্রচেষ্টা ছিল নারীমুক্তির ও নারী স্বাধীনতার। তিনি বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ নিবারণ এবং বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে আজীবন লড়াই ও সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি হিন্দু শাস্ত্র মতে বিশেষ করে পরাশর সংহিতা ও মনুসংহিতা উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন যা অবশেষে আইনসিদ্ধ হয়।

বিধবা বিবাহ চালু করার সাথে সাথে তিনি বহুবিবাহ বন্ধ করতেও বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালে তিনি একটি বহুবিবাহ রোধের সপক্ষে পুস্তিকা প্রকাশ করেন। বহুবিবাহ রোধ করতে তিনি তৎকালীন সরকারের কাছে আবেদন করলেও হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতায় তাঁর প্রচেষ্টাকে সফল করতে পারেননি।

বিদ্যাসাগর ও নারী শিক্ষা (Vidyasagar & woman education) :

ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতির ধারক ও বাহক ছিলেন বিদ্যাসাগর। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ও প্রচারে নিজ প্রচেষ্টায় এবং তৎকালীন সমাজ ও সরকারের আংশিক সহযোগিতায় তিনি উপযুক্ত পথ দেখিয়েছিলেন।

(i) বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা : ১৮৪৯ সালের মে মাসে বেথুন সাহেবের সহকারী হয়ে নারীশিক্ষার প্রথম অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন বিদ্যাসাগর। এই বিদ্যালয়ের প্রথম সম্পাদক হন বিদ্যাসাগর। বাড়ির মেয়েদের এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট হয়ে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, স্ত্রী জাতি শিক্ষিতা ও জ্ঞানসম্পন্না হলে তারা শিশুদেরকে সুশিক্ষা দিতে পারবে।

(ii) **গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষার বিস্তার :** নারীশিক্ষা গ্রামে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে তিনি প্রথম ১৮৫৭ সালে জৌগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

(iii) **নারী শিক্ষার ভাণ্ডার গঠন :** তিনি দেশীয় বর্গের মানুষের কাছ থেকে আর্থিক অনুদানের জন্য নারীশিক্ষা ভাণ্ডার গঠন করেছিলেন।

(iv) **সরকারি সাহায্য গঠন :** ১৮৫৭ সালে হ্যালিডে সাহেবের সহায়তায় তিনি বাংলার বিভিন্ন গ্রামে, যেমন— মেদিনীপুরে ৩টি, বর্ধমানে ১১টি, হুগলিতে ২০টি, নদীয়ায় ১টি এইভাবে মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সেগুলিতে মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৫০০।

(v) **উচ্চশিক্ষায় নারী :** তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার দর্পণে বেথুন সাহেব যখন শিক্ষায়িত্রী হিসাবে মেয়েদেরকে গড়ে তুলেছিলেন তখন বিদ্যাসাগর প্রবল উৎসাহে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

(vi) **বিধবা বিবাহ প্রবর্তন :** সমাজের মূলস্রোতে নারীদেরকে ফিরিয়ে আনতে তিনি বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। এবং অন্যদিকে তিনি বিধবা বিবাহের সূচনা করেছিলেন।

(vii) নারী শিক্ষার উপযুক্ত পাঠক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি এবং শিক্ষা সরঞ্জাম তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। বিদ্যালয়ে আসা ও যাওয়ার জন্য তিনি গাড়ি বা পালকির ব্যবস্থা করেছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' :

প্রতিটি বাঙালি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রারম্ভে যে বই তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় তা হল : বিদ্যাসাগরের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ। শিক্ষার হাতেখড়ি বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে শুরু হয়।

বর্ণপরিচয় মূলত :—

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য।
- স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, শব্দ, বাক্য ও ছোটো ছোটো অনুচ্ছেদে বর্ণপরিচয়টি সুসজ্জিত।
- ক্রমবর্ধমান সরল ধারায় সরল থেকে জটিল, বিশেষ থেকে সাধারণ এবং মূর্ত থেকে বিমূর্ত এভাবে বর্ণপরিচয়টি রচিত। বিদ্যাসাগরের মধ্যে শিক্ষা মনস্তত্ত্বের উপর গভীর আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।
- বর্ণপরিচয়ে বাংলায় অপ্রয়োজনীয় সংস্কৃত অক্ষর ঌ ও ৠ-কে বর্জন করেছিলেন।
- বর্ণপরিচয়ে ভাষার যতিচিহ্নের ব্যবহার হয়েছিল।
- অক্ষরের সংখ্যাও সুনির্দিষ্ট হয়েছিল।
- সাধু ও চলিত ভাষার পৃথকীকরণ হয়েছিল বর্ণপরিচয়ে।
- বিশেষ্য, বিশেষণ, উচ্চারণ রীতির প্রবর্তন ইত্যাদি বর্ণপরিচয়ে ঘটিয়েছিলেন।
- বর্ণপরিচয়ে শব্দসমষ্টি দিয়ে সুসংবদ্ধ এবং সুন্দর বাক্য রচনা করলেন।
- বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগে ব্যাকরণের সুললিত বিন্যাস ঘটালেন।
- শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, মানসিক, নৈতিক বিকাশ উপযোগী ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রথম সোপান স্থাপন করেছিলেন বর্ণপরিচয়ে। ছোটো ছোটো ঘটনা তথা গল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি বৌদ্ধিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের পথ দেখালেন।
- বর্ণপরিচয় বইটির বিন্যাস, মুদ্রণ এবং উপস্থাপনা সমাজের বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে।

তাই বলা যায় 'বর্ণপরিচয়' এর সৃষ্টি দ্বারা বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিশুদের জন্য তিনি 'বর্ণপরিচয়' (১ম ভাগ ও ২য় ভাগ) প্রকাশ করেন ১৫ এপ্রিল ১৮৫৩ সালে এবং ১৪ জুন ১৮৫৫ সালে।

বিবেকানন্দ : ভারতীয় চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী, নবজাগরণের অন্যতম প্রতীক পুরুষ হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতীয় উপনিষদ ও বেদান্তের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করেছেন এবং ভারতবাসীকে সেই উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। পদানত শোষিত ভারতবর্ষের মানুষকে জাগ্রত করতে, হৃতগৌরব সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন করতে, কুসংস্কার দূর করে, আধ্যাত্ম জীবনের জন্য যথাযথভাবে উন্মুখ করতে তিনি Man Making Education-এর কথা বলেন। শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলা, শিক্ষার সুযোগ সবার জন্য সৃষ্টি করা, এ ছিল স্বামীজির ব্রত। শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের অনন্ত সম্ভাবনাময় সত্তার উন্মোচন হয়, সম্ভাবনা প্রস্ফুটিত হয়, শক্তির বিকাশ হয়। কর্মযোগী এই যুগনায়কের অকাল প্রয়াণ ঘটে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে।

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মীয় শিক্ষা

বিবেকানন্দ বলেছেন— আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি হল ধর্ম — শুধুই ধর্ম। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড। ইহার উপর আমাদের জীবন রূপ প্রাসাদের মূলভিত্তি স্থাপিত ..... মানব সমাজ থেকে এই ধর্মকে বাদ দিলে কী থাকিবে? বর্বরে পরিপূর্ণ একটি অরণ্যানী ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না। তাই বিবেকানন্দ ধর্মশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এই ধর্মশিক্ষা নির্দিষ্ট কোন ধর্মীয় আচার-আচরণ সর্বস্ব নয়। সমস্ত ধর্মের মূলনীতি শিক্ষার্থীদের কাছে সমানভাবে তুলে ধরার কথা তিনি বলেছেন। তিনি ধর্মশিক্ষার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ থেকে ছোটো ছোটো নীতিমূলক গল্প অনুবাদ করে শিশু শিক্ষার্থীদের পড়ানোর কথা বলেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার লক্ষ্য :

স্বামী বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার সংজ্ঞা হল : ''Education is the manifestation of perfection already in man'' অর্থাৎ মানুষের মধ্যে মহত্বের প্রকাশই হল শিক্ষা। তাঁর মতে জ্ঞান মানুষের অন্তরের বিষয়। বাইরে থেকে শিশুর অভ্যন্তরে জ্ঞান সঞ্চালন করা যায় না। শিক্ষার্থীর মনের মধ্যেই জ্ঞান সঞ্চিত আছে যার প্রকাশের জন্য অনুধাবনের প্রয়োজন। শিক্ষার সংস্কারে তাঁর উল্লেখিত দুটি শব্দের বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই দুটি শব্দ হল 'Perfection' (মহত্ত্ব) এবং 'Manifestation' (প্রকাশ)। মহত্ত্ব বলতে ব্যক্তির গুণাবলির কথা বলেছেন, ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় আস্থাশীল বিবেকানন্দ ব্যক্তির মধ্যে সব কিছুকেই মহৎ মনে করেন। ব্যক্তির মধ্যে এই মহৎ গুণগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বলে। প্রকাশ শব্দটির তাৎপর্য হল কোনো কিছু ব্যক্ত বা পরিস্ফুট করার জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন। পরিবেশের মধ্যেই ব্যক্তির মহত্বের প্রকাশ ঘটে। বিবেকানন্দ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

স্বামীজির মতে, শিক্ষার লক্ষ্য এই নয় যে মস্তিষ্ককে দুষ্পাচ্য তথ্যে ভারাক্রান্ত করতে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য হল জীবন গঠন, মানুষ তৈরি করা, চরিত্র গঠন করা। তিনি বলেছেন— শিক্ষা সৃজনশীলতা, মৌলিকত্ব এবং উৎকর্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করবে। ''Education should lay proper emphasis on creativity, originality & excellence.

তিনি খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন — ''সব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল মানুষ তৈরি করা, সমস্ত প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও শেষ কথা হল মানুষের বিকাশ''।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষায় পাঠক্রম :

একটি চারাগাছের মহীরূহ হয়ে ওঠার সঙ্গে শিশু শিক্ষার্থীদের বড়ো হওয়ার তুলনা করেছেন। তাঁর মতে চারাগাছের মহীরূহ হওয়ার শক্তি নিজের মধ্যে বর্তমান। শুধু প্রয়োজন মতো রৌদ্র, জল ও বায়ুর জোগান দিতে হবে এবং অন্যে যাতে গাছটিকে নষ্ট না করে তার জন্য গাছের চারিদিকে বেড়া দেওয়া প্রয়োজন। শিশু শিক্ষার্থীও নিজের শক্তিতে ক্রমশ বড়ো হয়ে ওঠে। শুধু দেহ ও মনে পূর্ণতা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করতে হবে এবং তার আত্মবিকাশ যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য বাধাগুলির হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করতে হবে।

স্বামীজির মতে শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠন হবে, মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটবে, বুদ্ধির সম্প্রসারণ ঘটবে এবং মানুষ হবে আত্মনির্ভরশীল। পাঠক্রম হবে চরিত্র গঠনের সহায়ক, মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে সমর্থ হবে, বুদ্ধির বিকাশ ঘটাবে ও ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল করতে সাহায্য করবে।

পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে স্বামীজি সেই সময়কালের জাতীয় প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। জনগণের জীবনের উপযোগী পাঠক্রম রচনা করতে হবে। তারা যাতে আত্মনির্ভর, কর্মক্ষম, স্বাধীন ও যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে সেদিকে গুরুত্ব দেবার কথা বলেছেন।

পাঠক্রমে তিনি ধর্মীয় শিক্ষা, মাতৃভাষার চর্চা, সংস্কৃত চর্চা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, সাধারণ জ্ঞান, সংগীত প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি কারিগরি, শিশু শিক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি তাঁর পাঠক্রমে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন।

- **নিজ অগ্রগতি যাচাই (Check your progress) :**

(i) সবরমতী আশ্রম কে প্রতিষ্ঠা করেন?

(ii) বুনিয়াদি শিক্ষার মূলভিত্তি কী?

(iii) শ্রী অরবিন্দ কোন ধরনের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন?

(iv) বিশ্বভারতী কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

(v) রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শনের মূল ভিত্তি কী ছিল?

(vi) আশ্রমিক শিক্ষার প্রবক্তা কে?

(vii) বিধবাবিবাহ কে প্রচলন করেছিলেন?

(viii) নারী শিক্ষায় কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন?

(ix) ‘‘বর্ণপরিচয়’’ কে তৈরি করেন?

(x) মানুষ তৈরির শিক্ষার কথা কে বলেছেন?

(xi) কে ধর্মীয় শিক্ষার কথা বলেছেন?

- **শিখন ফলাফল (Learning outcome) :**

(i) গান্ধীজির আদর্শ শিক্ষার লক্ষ্য জানতে সমর্থ হবেন।

(ii) শ্রী অরবিন্দের নৈতিক এবং ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

(iii) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য জানতে পারবেন।

(iv) বিদ্যাসাগরের প্রাথমিক শিক্ষার অবদান জানতে পারবেন।

(v) বিবেকানন্দের ধর্মীয় শিক্ষার বিষয় বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৫.৩ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ : রুশো, ডিউই, ফ্রয়েবেল, মন্তেসরি, পিঁয়াজে (Western Thinkers : Rousseau, Dewey, Froebel, Montessori, Piaget)

উদ্দেশ্য :

(a) রুশোর শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানা।

(b) প্রকৃতি সম্পর্কে রুশোর ধারণা জানতে পারা।

(c) ডিউই -এর শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে জানা।

(d) ডিউই-এ শিক্ষণ পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে জানা।

(e) ফ্রয়েবেলের শিক্ষার পাঠক্রমের প্রকৃতি জানতে পারা

(f) ফ্রয়েবেলের শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে জানা।

(g) ফ্রয়েবেলের শিক্ষার অবদান সম্পর্কে আলোচনা।

(h) কিন্ডারগার্টেন ও মন্তেসরি পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করতে পারা।

(i) মন্তেসরি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারা।

(j) পিঁয়াজের প্রজ্ঞার বিকাশ সম্পর্কে জানা।

(k) প্রজ্ঞার বিকাশের স্তর সম্পর্কে জানা।

(l) প্রাক-সক্রিয়তার স্তর সম্পর্কে আলোচনা।

জ্যাঁ জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) : ফরাসি বিপ্লবের ভূমিকা-রচনাকারী হিসেবে তিনি অন্যতম। রুশোর চিন্তাধারা তৎকালীন ধর্ম, সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি সমস্ত ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার প্রধান কারণ সে যুগের আশা ও আকাঙ্খা রুশোর চিন্তায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। রুশোর চিন্তা ও আদর্শ মূলত নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক হলেও মধ্যযুগীয় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অচলায়তনকে ধ্বংস না করে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের নবযুগ প্রবর্তন সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর চিন্তার সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ১৭৬১ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "The new Heloise", ১৭৬২ সালে বিখ্যাত রাজনৈতিক গ্রন্থ "The Social Contract" এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ "Emile" প্রকাশ করেন।

রুশোর শিক্ষণ পদ্ধতি :

রুশো মনে করতেন যে, শিশুর প্রকৃতি স্বভাবতই সৎ, অবিকৃত এবং পবিত্র। তার আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য তাকে দিতে হবে স্বাধীনতা। তাদের মন যাতে অসৎ এর দিকে না যায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। রুশো মনে করতেন, বুদ্ধির বিকাশ নির্ভর করে ইন্দ্রিয়ের বিকাশের উপর। তাই তিনি ইন্দ্রিয়ের পরিচালনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর পদ্ধতির মূল কথা হল নেতিবাচক শিক্ষা, যার বৈশিষ্ট্য হল ইন্দ্রিয়ের পরিমার্জন এবং যুক্তিশক্তির স্বাভাবিক বিকাশ করে শিক্ষাদান। যে শিক্ষা সরাসরি জ্ঞানদানের পূর্বে, জ্ঞান আহরণের উপকরণগুলিকে বা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে পরিমার্জন করে জ্ঞান গ্রহণের উপযোগী করে তুলতে সহায়তা করে, তাই হল নেতিবাচক শিক্ষা।

রুশো মৌলিক শিক্ষাদান সমর্থন করেননি। তাঁর মতে শিশু এগুলি শোনে না। শুনলেও মনে রাখে না। শিক্ষাদানের কৌশল হিসাবে তিনি হিউরিস্টিক এই পদ্ধতির কথা বলেছেন। এই পদ্ধতিতে শিশুকে আবিষ্কারকের ভূমিকায় বসানো হয়। শিশু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে। এই পদ্ধতিতে তিনি ‘এমিল’—কে গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, সামাজিক সম্পর্ক এবং নৈতিকতার শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে রুশোর এই চিন্তাধারা থেকে আধুনিক পদ্ধতি যেমন— ল্যাবরেটরি পদ্ধতি, কাজের মাধ্যমে শিক্ষা, সমস্যা পদ্ধতি প্রভৃতি অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতিগুলির উদ্ভব হয়েছে।

প্রকৃতি সম্পর্কে রুশোর ধারণা :

রুশো 'প্রকৃতি' শব্দটিকে তিনটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। যথা (i) মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি (ii) জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি ও (iii) জাগতিক প্রকৃতি।

(i) মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি ও শিক্ষা : রুশো তাঁর প্রকৃতিবাদে শিশুর মানসিক বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শিশুর শিক্ষা হবে তার জন্মগত প্রকৃতি অর্থাৎ তার প্রবৃত্তি, চাহিদা, ইচ্ছা, প্রক্ষোভ ও অনুরাগ অনুযায়ী। এখানে প্রকৃতি বলতে তিনি মনঃপ্রকৃতিকেই বুঝিয়েছেন।

(ii) জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি ও শিক্ষায় রুশো বলেছেন, সমাজ সৃষ্টির আগে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ বসবাস করত। তখন মানুষ ছিল সামাজিক প্রভাবমুক্ত। রুশোর মতে, শিশু তার জৈবিক সত্তার নিয়মানুযায়ী প্রকৃতির রাজ্যে যেমনভাবে বিকাশ লাভ করত, ঠিক তেমনভাবেই বর্তমানে বিকাশ লাভ করবে। সে তার জৈবিক চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, সামাজিক প্রভাব দ্বারা নয়। এজন্য শিশুকে সমাজ পরিবেশ থেকে সরিয়ে এনে প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে রাখতে হবে।

(iii) জাগতিক প্রকৃতি ও শিক্ষা : রুশো এমিলের শিক্ষার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ''উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হলে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিতে হবে। গাছপালা, নদনদী, পশুপাখি ইত্যাদির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মাধ্যমে সে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে সেটাই হবে তার প্রাথমিক ধাপ। প্রকৃতি হবে তার সুযোগ্য শিক্ষক।

জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২) : আমেরিকার আধুনিক ইতিহাসে গণতন্ত্র ও প্রগতিতে বিশ্বাসী আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক জন ডিউই। তিনি তাঁর শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষাদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং সুদীর্ঘ সাত বৎসর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই বিদ্যালয়ে তাঁর সুচিন্তিত শিক্ষাদর্শ, বাস্তবক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষা নীতিগুলি কতটা কার্যকর তারও মূল্যায়ন করেন। তাঁর রচিত 'Democracy and Education' বিশেষভাবে সমাদৃত হয় ও শিক্ষা পরিচালনায় এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। প্রয়োগবাদে বিশ্বাসী ডিউই জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে কোন চিরসত্য ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি জীবনকে একটি নিরন্তর বৃদ্ধিসাধনের গতিশীল প্রক্রিয়ারূপে গণ্য করেছেন। তাই তিনি বলেছেন, শিক্ষাই জীবন, জীবনই শিক্ষা— এ দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

জন ডিউই -এর শিক্ষাদর্শন :

ডিউই শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জীবনকে নিরন্তর বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনমূলক প্রক্রিয়া রূপে বর্ণনা করেছেন। শিক্ষা ও জীবনকে সমার্থক প্রক্রিয়া হিসাবে বিচার করেছেন। তাঁর সংজ্ঞানুযায়ী শিক্ষা একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া যা সার্থকতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে লাভ করা যায়, ডিউই অন্যান্য দার্শনিকের ন্যায় শিক্ষার কোনো চরম লক্ষ্যের ধারণায় বিশ্বাসী নন। শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষা প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত সার্থকতাকে খোঁজা প্রয়োগবাদী দার্শনিক ডিউই জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে চিরসত্য ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। জীবনের মূল্য বলতে তিনি জীবনের বৃদ্ধিমূলক চাহিদাকে বুঝিয়েছেন। কোনো না কোনো বাস্তব চাহিদা পূরণের মধ্যে দিয়ে তৃপ্তি দানই হল Value বা মূল্য। তাঁর মতে গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে ব্যক্তিজীবনের বৃদ্ধিসাধনের অনুকূল সামাজিক অভিজ্ঞতা পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া হল শিক্ষা। ডিউই বলেছেন, ''শিক্ষাই জীবন, জীবনই শিক্ষা এই দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।''

ডিউই তাঁর শিক্ষা ধারণার ভিত্তিতে প্রয়োগ সাধনের বিভিন্ন দিকগুলিকে বিচার করেছেন, তাঁর নির্ধারিত আদর্শকে অনুসরণ করে শিক্ষা পাঠক্রমকে একটি অভিজ্ঞতা ও সক্রিয়তাভিত্তিক বাস্তব রূপদানের কথা বলেছেন। তত্ত্বমূলক বিষয়ের অনুশীলনের পরিবর্তে আত্মসক্রিয়তামূলক ক্রিয়াকর্ম ও সমাজ অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনই হল এই পাঠক্রমের মূলভিত্তি। এটিকে অনেকেই Experience Curriculum, আবার অনেকে Activity Curriculum নামে ব্যাখ্যা করেছেন। শুধুমাত্র দৈহিক সক্রিয়তাই নয়, চিন্তনমূলক বৃদ্ধি ও বিকাশসাধনের উপাদানের সমন্বয়ে ডিউই -এর শিক্ষা পাঠক্রম সংগঠিত হয়েছে।

ডিউই -এর শিক্ষণ পদ্ধতি :

ডিউই -এর পাঠক্রমিক ধারণার সাথে মিল রেখে শিক্ষণ পদ্ধতির ধারণাটিও গড়ে উঠেছে। ডিউই শিখনে শিশুর আত্মশিখনের উপরে বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে শিশু নিজের প্রচেষ্টায় শিক্ষা লাভ করবে। শিশু নিজেই তার শিখনের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু নির্বাচন করবে যার মধ্যে শিশুর বৃদ্ধিমূলক চাহিদা পূরণের প্রশ্ন বা সমস্যা যুক্ত থাকবে। সমস্যাকে আত্মসক্রিয়তামূলক কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে সমাধান করাই আত্মশিখনমূলক বৃদ্ধিসাধনের ভিত্তি হিসাবে গড়ে উঠবে। সমস্যা সমাধানমূলক প্রক্রিয়াই ডিউই -এর মতে শিক্ষার আদর্শ পদ্ধতি। একে Problem Solving Method বলা হয়। ডিউই -এর শিক্ষণ পদ্ধতি কয়েকটি স্তর বা পর্যায়ে কার্যকর হয়ে থাকে।

- সমস্যার পরিচয় বা নির্ধারণ।
- সমস্যার বিশ্লেষণ।
- সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা রচনা করা।
- পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা।
- অর্জিত অভিজ্ঞতা ও সাফল্য ব্যর্থতা সম্পর্কে মূল্যায়ন।

ডিউই তাঁর পদ্ধতিকে (Learning by doing) অর্থাৎ হাতেকলমে কাজ বা অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়াকে আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি বলেছেন; শিক্ষায় শৃঙ্খলা সম্পর্কে ডিউই শিশুর স্বাধীন আত্মশৃঙ্খলার ধারণাটিকে বেশি গুরুত্ব সহকারে বলেছেন। একে মুক্ত শৃঙ্খলাও বলা হয়। এই উদ্দেশ্যে ডিউই গৃহ জীবনের অনুরূপ একটি স্বাভাবিক সংগঠন হিসাবে বিদ্যালয় জীবন সংগঠনের কথা বলেছেন।

ফ্রেডরিক উইলহেম অগাস্ট ফ্রয়েবেল (১৭৮২-১৮৫২) : জার্মান দার্শনিক ফ্রয়েবেল-এর শিক্ষা-চিন্তা ও দর্শনে ভাববাদের প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর নিকট শিক্ষা ও বিকাশ সমার্থক। শিশুর পরিপূর্ণ সামগ্রিক বিকাশকে সুনিয়ন্ত্রিত করাই শিক্ষার লক্ষ্য। তাঁর মতে, সমগ্র প্রকৃতি, বহিঃপ্রকৃতি, অন্তর প্রকৃতি, সমাজ— সব কিছুর সাথে আপন সত্তার একাত্মবোধ তখনই সম্ভব, যখন শিক্ষা যথার্থ সম্পূর্ণ হয়। তাঁর দৃষ্টি ছিল শিশুর প্রতি— তার বিকাশের ধারা নির্দেশ করে, শিক্ষার বিষয় ও প্রণালী কী করে চালনা করতে হবে, সেই ছিল তাঁর চিন্তা। ফ্রয়েবেল তাঁর কিন্ডারগার্টেনে প্রাক্ বিদ্যালয় শিশু শিক্ষার সমস্যা-সমাধানেই ব্যস্ত ছিলেন, তথাপি তাঁর শিক্ষানীতিতে এমন কতকগুলো সূত্র আছে, যা সমগ্র শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই বর্তমানে সমস্ত শিশুশিক্ষা ফ্রয়েবেল-এর কিন্ডারগার্টেনের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই অগ্রসর হচ্ছে।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষার লক্ষ্য :

তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে তিনটি —

- প্রথমত, আধ্যাত্মিক একতা : বিশ্বজগতের মূল শক্তি হল ঐক্য তথা ঈশ্বর। মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য হল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যকে উপলব্ধি করা। শিক্ষার চরম লক্ষ্য হবে চরম সত্যকে, আধ্যাত্মিক ঐক্যকে নিজের আত্মার মধ্যে উপলব্ধি করায় সহায়তা করা।
- দ্বিতীয়ত, তাঁর মতে শিশু সমস্ত গুণ নিয়ে জন্মায়, শিক্ষার লক্ষ্য হল সকল গুণের সম্ভাবনার উন্মেষণ। শিক্ষা বাইরে থেকে চাপানো কোনো শক্তি নয়, এটি আসে অন্তর থেকে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানুষকে ওই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ায় উপলব্ধিতে সহায়তা করা।
- তৃতীয়ত, তিনি মনে করতেন শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের জন্য বাইরের কোনো শক্তির প্রয়োজন হয় না। শিশু নিজেই স্বাভাবিকভাবে সক্রিয় হয়। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুকে সক্রিয় হতে সাহায্য করার জন্য অনুকূল পরিবেশ রচনা করা।

ফ্রয়েবেলের পাঠক্রম :

(i) ফ্রয়েবেল গণিত শিক্ষার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ধর্ম যেমন হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত গণিত তেমনি, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত। গণিত মানুষের বৌদ্ধিক শক্তিকে বিকাশ করে বিশ্বজগতের ঐক্যের সূত্র খুঁজে বের করতে সহায়তা করে।

(ii) তিনি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্বসত্তার সঙ্গে একত্রীভূত হবার কথা বলেছেন।

(iii) প্রকৃতি জগৎ শিশুর কাছে এক বিরাট ঐক্যের সংকেত বহন করে তাই সংকেতের দ্বারা উদ্বুদ্ধ শিশু তার মানসিক জীবনে ঐক্য আনবে এবং নৈতিক জীবনের বিকাশ স্বইচ্ছায় করবে।

(iv) অঙ্কন পাঠের মাধ্যমে সৌন্দর্যবোধ গড়ে উঠবে এবং শিশুরা বিশ্বের ঐক্য উপলব্ধি করতে পারবে।

(v) মাটির সাহায্যে বিভিন্ন জিনিস তৈরির মধ্য দিয়ে শিশু আত্মসক্রিয়তাকে চরিতার্থ করতে পারবে।

(vi) ফ্রয়েবেল পাঠক্রমে কায়িক পরিশ্রমকে স্থান দিয়েছেন।

(vii) ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান পাঠের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপনের কথা বলেছেন।

(viii) গান, নাচ, খেলাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন।

(ix) পাঠক্রমে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার কথা বলেছেন।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষায় অবদান :

(i) ফ্রয়েবেলের Kindergarten পরবর্তীকালে পৃথিবীর সমগ্র দেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। ক্রমশই ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্সে এই বিদ্যালয়ের অনুকরণে একাধিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

(ii) তিনি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ পরিবেশের গুরুত্বের কথা বলেছেন। তিনি তাঁর বিদ্যালয়কে সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলেছেন, শিক্ষালয় সম্পর্কে তাঁর ধারণা আধুনিক জীবনে বিশেষ সমাদৃত।

(iii) তিনি যথাযোগ্য সুযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ অনুযায়ী বিশ্বের ঐক্য উপলব্ধির মাধ্যমে আত্মবিকাশে সহায়তা করার কথা বলেছেন। স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তাকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে তার থেকে ভাল ফল পাওয়া যায় না তিনি একথাও বলেছেন।

(iv) ফ্রয়েবেল শিশুর শিক্ষা তার স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম থেকে সৃষ্টি হবার কথা বলেছেন। তিনি শিশুর কর্ম নির্বাচনে অবাধ স্বাধীনতা দান করেছেন। শিশু তার মনোধর্ম অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ করবে এটাই তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতির মূলকথা। তিনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে মর্যাদাদানের কথা বলেছেন। তিনি শিক্ষাকে খেলাভিত্তিক করার কথা বলেছেন। তাঁর বৃত্তিগুলির মাধ্যমে তিনি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তনের কথা বলেছেন।

মাদাম মারিয়া মন্তেসরি (১৮৭০-১৯৫২) : ডাক্তারি পাস করে তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকে সহকারী চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হন। রোমের অরথোফ্রেনিক স্কুলের ডিরেকট্রেস হিসেবে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের পর্যবেক্ষণ ও নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষাদানের অধিকতর সুযোগ লাভ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষা হবে শিশুকেন্দ্রিক। প্রত্যেক শিশু তার নিজস্ব শক্তি, প্রয়োজন ও শারীরিক-মানসিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী স্বেচ্ছায় শিক্ষার পথে অগ্রসর হবে। তাঁর মতে শিক্ষা হল, ''শিশুর জীবনের স্বাভাবিক বিস্তারের কাজে সক্রিয় সাহায্যদান।'' রাস্ক্ তাই মন্তেসরির শিক্ষাকে ''মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক শিখন'' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিশুদের সমগ্র সত্তার সুষম ও সম্পূর্ণ বিকাশ। শিশু সবল, সুস্থ, নিপুণ, ভদ্র, নীতিবান ও বিশ্বাসী মানুষ হয়ে বিকশিত হবে— এই হচ্ছে তাঁর বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উদ্দেশ্য।

মন্তেসরি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা : To discuss the characteristics of Montessori Method

- **অবাধ স্বাধীনতা :** এই পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে শিশুর মনের বিকাশ ঘটানো। শিশুর কাজে শিক্ষক এখানে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করেন না। শিক্ষিকা এখানে শিশুকে নিয়মমাফিক পরিচালনা করবেন। শিক্ষিকা কর্তৃত্বময়ী হবেন না, তিনি হবেন স্নেহশীল, সহানুভূতিসম্পন্ন জননীর ন্যায় পরিচালিকা। মন্তেসরির শিক্ষানীতি গণতান্ত্রিক নীতির উপর তৈরি হয়েছিল।
- **সক্রিয়তা :** এই পদ্ধতিতে শিশু সক্রিয়তার মাধ্যমে নিজেই শিখবে, শিক্ষিকা অবশ্যই একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে কাজ করবেন। শিক্ষিকাও যথেষ্ট সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে শিশুর কার্যকলাপ দেখবেন। শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে দিয়ে, অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে শিখবে।
- **অনুশীলন :** মন্তেসরি শিক্ষাব্যবস্থায় ইন্দ্রিয় অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে। এখানে ইন্দ্রিয় চর্চার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর জন্য কতকগুলি যন্ত্র যেমন : ডাইড্যাকটিক যন্ত্রের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এই যন্ত্র নিয়ে শিশুরা খেলাধুলা করবে এবং শিশুর ইন্দ্রিয় পরিমার্জিত হবে যাকে আবার ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ বা Sense Training বলা হয়ে থাকে।
- **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য :** মন্তেসরির মতে প্রত্যেক শিশু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সকল শিশুকে একইভাবে দেখলে হবে না, নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তারা কাজ করে। তাই প্রতিটি শিশুর নিজস্ব সত্তা বিবেচনা করে পৃথক শিক্ষা দিতে হবে। এজন্য এ পদ্ধতিতে দলগত শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

কিন্ডারগার্টেন ও মন্তেসরি পদ্ধতির মধ্যে তুলনা :

(i) কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিশুকে সুনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা দেওয়া হলেও মন্তেসরি পদ্ধতিতে অবাধ ও পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকে।

(ii) কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে এবং মন্তেসরি পদ্ধতিতে শিশুর আত্মসক্রিয়তার উপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে। মন্তেসরি পদ্ধতিতে এর গুরুত্ব অধিক।

(iii) কিন্ডারগার্টেনে শিশুর খেলাভিত্তিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে অন্যদিকে মন্তেসরি পদ্ধতিতে শিশুর ক্রীড়া প্রবণতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(iv) কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিশুর ইন্দ্রিয় অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয় অন্যদিকে মন্তেসরি পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল ইন্দ্রিয় অনুশীলন।

(v) কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযোগী। মন্তেসরি পদ্ধতিও প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযোগী।

(vi) কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে বৃত্তি ও উপহারের ব্যবহার করা হলেও মন্তেসরি পদ্ধতিতে ডাইড্যাকটিক অ্যাপারেটাস ব্যবহার করা হয়।

(vii) কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য শিক্ষিকার উপর দায়িত্ব দেওয়া হলেও মন্তেসরি পদ্ধতিতে আত্মশৃঙ্খলার বা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব দেওয়া আছে।

(viii) শিক্ষিকার উপর নিয়ন্ত্রণমূলক দায়িত্ব কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে দেওয়া হলেও মন্তেসরি পদ্ধতিতে স্বাধীনভাবে খেলা নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া আছে।

(ix) কিন্ডারগার্টেন একটি দলগত শিক্ষণের পদ্ধতি হলেও মন্তেসরি ব্যক্তিগত শিখনের পদ্ধতি।

(x) কিন্ডারগার্টেন শিখনে অন্যতম উদ্দেশ্য হল বিশ্বাত্মার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন, অন্যদিকে মন্তেসরি পদ্ধতিতে শিখনের উদ্দেশ্য হল শিশুর কর্মেন্দ্রিয় সক্রিয় করা।

জ্যাঁ পিঁয়াজে (১৮৯৬-১৯৮০) : শিশুদের প্রজ্ঞামূলক বিকাশের উপর দীর্ঘ সময়ব্যাপী গবেষণা করে শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দিক উন্মোচন করেন। তিনি নিজেকে জেনেটিক এপিস্টেমোলজিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করতেন, জৈবিক নিয়মানুযায়ী শিশুর প্রজ্ঞার সংগঠন বিকশিত হয়। তিনি নিজের তিন সন্তানের উপর পর্যবেক্ষণ করে তাঁর প্রজ্ঞামূলক বিকাশ তত্ত্বে চারটি স্তর বা পর্যায়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পিঁয়াজের গবেষণা ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষাতত্ত্ব ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তনের কারণ হয়েছিল। যেমন- শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা। প্রজ্ঞামূলক বিকাশের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, শিক্ষণ-পদ্ধতি ও বিষয় নির্ধারিত হওয়া উচিত প্রজ্ঞামূলক বিকাশের প্রতিটি স্তরের চাহিদার নিরিখে।

পিঁয়াজের প্রজ্ঞামূলক বিকাশের তত্ত্ব :

তিনি শিশুর জ্ঞান বিকাশের প্রক্রিয়ার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন জৈবিক নিয়মানুযায়ী শিশুর প্রজ্ঞার সংগঠন বিকশিত হয়। প্রজ্ঞামূলক বিকাশের চারটি স্তর আছে। প্রতিটি স্তরই তার পূর্ববর্তী স্তরের উপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়। শিশুর প্রজ্ঞামূলক বিকাশের সূচনা হয়— স্পর্শ, দর্শন, স্বাদ ইত্যাদি প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

পিঁয়াজে তাঁর প্রজ্ঞামূলক তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কয়েকটি ধারণার উল্লেখ করেছেন।

স্কিমা : স্কিমা হল কোনো মুহূর্তে অর্জিত তথ্যসমূহের একক সংগঠন। শিশু যখন নতুন নতুন তথ্য আয়ত্ত করে তার স্কিমা সম্প্রসারিত হতে থাকে। এভাবে সমগ্র জীবনব্যাপী ব্যক্তির স্কিমা সম্প্রসারিত হতে থাকে। সম্প্রসারণে দুটি প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়। যথা— অভিযোজন এবং সাংগঠনিকীকরণ।

অভিযোজন (Adaptation) : পিঁয়াজের মতে অভিযোজন দুটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে সাধিত হয়। এই দুটি প্রক্রিয়া হল আত্তীকরণ এবং সহযোজন।

আত্তীকরণ (Assimilation) : আত্তীকরণ হল কোন স্কিমা বা প্রজ্ঞামূলক সংগঠনের নতুন তথ্য, চিন্তাধারণা বা ভাবের সংযোজন, যার ফলে স্কিমা পরিবর্তন তথা সম্প্রসারিত হয়। পিঁয়াজের প্রজ্ঞামূলক তত্ত্বে অর্জিত জ্ঞানের যে স্কিমা বা প্রজ্ঞামূলক সংগঠন হয়েছে তার মধ্যে যুক্ত হয়ে স্কিমা সম্প্রসারিত হয়ে থাকে।

সহযোজন (Accomodation) : নতুন তথ্য, চিন্তা, ভাব ইত্যাদি প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করে স্কিমার মধ্যে যুক্ত করা। পরিবেশের নতুন তথ্য, চিন্তা, বিষয় ইত্যাদি যদি বর্তমান স্কিমার পক্ষে সরাসরি গ্রহণ করতে অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে উক্ত তথ্য, চিন্তার বিষয় ইত্যাদিকে প্রয়োজন মতো বিন্যস্ত বা পরিবর্তন করে স্কিমা বা প্রজ্ঞামূলক সংগঠনের মধ্যে যুক্ত করা হয়, একেই সহযোজন বলে।

যেমন— কঠিন কোনো ধারণা যদি বুঝতে অসুবিধা হয় উদাহরণের সাহায্যে বুঝে নিতে পারা যায়।

সাংগঠনিকীকরণ (Organisation) :

স্কিমা বা প্রজ্ঞামূলক সংগঠনসমূহ সংগঠিত হয়ে আরও জটিল চিন্তামূলক কাজ করতে সক্ষম হয়। একেই সাংগঠনিকীকরণ বলে, বই পাঠ করতে গেলে ঠিকমতো বই ধরতে হবে, পাতা ওলটাতে হয় এবং চোখ সঞ্চালন করতে হয়।

প্রজ্ঞামূলক বিকাশের স্তর :

পিঁয়াজের প্রজ্ঞামূলক বিকাশের চারটি স্তরের কথা বলা হয়েছে—

(১) সংবেদন—সঞ্চালকমূলক স্তর (Sensori motor stage) — জন্ম থেকে ২৪ মাস।

(২) প্রাক্-সক্রিয়তার স্তর (Pre-operational) — ২ থেকে ৭ বছর

(৩) মূর্ত-সক্রিয়তার স্তর (Concrete-operational stage) — ৭ বছর থেকে ১১ বছর

(৪) যৌক্তিক সক্রিয়তার স্তর (Formal operational stage) — ১১ বছর থেকে ১৪ বছর।

পরিণমন (Maturation) : পরিণমন বলতে বোঝায় শারীরিক বিকাশ, বিশেষ করে পেশি ও স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ।

অভিজ্ঞতা (Experience) : পিঁয়াজের মতে, ২ ধরনের অভিজ্ঞতা শিশুর প্রজ্ঞা বিকাশে সহায়তা করে।

প্রথমত, বস্তু সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য বস্তুর প্রতি প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন, যেমন— দুটি বস্তুকে হাতে নিয়ে কোনটি অন্যটির থেকে অপেক্ষাকৃত ভারী তা ঠিক করা।

দ্বিতীয়ত, ব্যবহারের মাধ্যমে বস্তু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন। যেমন— একটি বালক নুড়ি জাতীয় কিছু নিয়ে ওইগুলি ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ বা বৃত্তাকারে সাজিয়ে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ বা বৃত্ত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে।

সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Social Interaction) :

শিশুর সামাজিক পরিবেশে অন্যান্যদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করাকেই সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে শিশুর প্রজ্ঞার বিকাশ বলে। যেমন— মাতাপিতা শিশুদের বই পড়তে সাহায্য করেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শিক্ষাদান করেন।

ভারসাম্য : শিশু সব সময় আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। পূর্বোক্ত আত্তীকরণ, সহযোজন এবং সাংগঠনিকীকরণের সাহায্যে শিশু সর্বদা আত্মনিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের ক্লাসে নতুন কিছু শেখে (আত্তীকরণ), এগুলি অধ্যয়ন করে, আলোচনা করে এবং গ্রহণ করে (সহযোজন) এবং পরে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানের সঙ্গে যেমন বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে অধ্যয়ন বা আলোচনা করে সে তার জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করে।

শিখন প্রক্রিয়ার চারটি স্তর — পিয়াজেঁ যে চারটি স্তরের কথা বলেছেন তার **প্রথমটি** হল, **সংবেদন-সঞ্চালন স্তর (Sensori-motor stage)**।

সংবেদন-সঞ্চালন স্তর :

জন্মের পর থেকে দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুরা শুধু এই পদ্ধতিতেই শেখে। এখানে দুটি কথা বলা হয়েছে, তার প্রথমটি হল সংবেদন অর্থাৎ চোখ দিয়ে দেখে, কানে শুনে, স্বাদ গ্রহণ করে, গন্ধ ও স্পর্শের মাধ্যমে তার চারপাশের যত ব্যক্তি প্রাণি বা বস্তু আছে সে সম্বন্ধে স্কিমা গঠন করে। একটি টম্যাটো লাল, গোলাকার, মসৃণ, টক স্বাদযুক্ত। এইসব বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়ে টম্যাটো সম্বন্ধে তার স্কিমা তৈরি হয়। দ্বিতীয় কথাটি বলা হয়েছে সঞ্চালন, অর্থাৎ হাত, পা ইত্যাদি চালনা করে যে সব ধারণা গঠন করা যায় তাই। টম্যাটো গোলাকার ঠিকই কিন্তু তা শুধুমাত্র চোখ দিয়ে দেখেই বোঝা যায় না, সেই সঙ্গে হাত দিয়ে টম্যাটোকে ধরলে, চোখ বন্ধ করেও আমরা বলতে পারি সেটি গোলাকার। হাতের আঙুলগুলির সঞ্চালন ও চোখের দেখা এই দুই অভিজ্ঞতা একত্রিত হয়ে গোলাকার টম্যাটোর স্কিমা গঠিত হয়। এই কারণেই একে বলা হয়েছে সংবেদন-সঞ্চালন স্তর।

পিয়াজেঁ এই স্তরের শিশুদের স্কিমা গঠন প্রসঙ্গে দীর্ঘ ও জটিল ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং এই স্তরকে কয়েকটি উপস্তরে ভাগ করেছেন। কিন্তু সেগুলি বর্তমান প্রসঙ্গে অপ্রয়োজনীয়। এই বয়সের শিশুদের বিদ্যালয়ে পড়তে আসার প্রশ্ন নেই। শুধু এই স্তরের বিকাশ যাতে ঠিকঠিক হয় তার জন্য কয়েকটি বিষয় জেনে রাখা ভালো।

- এই বয়সের শিশুদের নানা আকারের ও রঙের জিনিসপত্র, খেলনা স্বাধীনভাবে নাড়াচাড়া করার সুযোগ দেওয়া দরকার।
- তারা যাতে অবাধে ঘোরাফেরা করতে পারে এবং ইচ্ছামত সবকিছু হাতে নিয়ে দেখতে পারে তার যথাসম্ভব সুযোগ দেওয়া দরকার।
- ছবির চেয়েও সরাসরি বাইরের চারপাশের বস্তু, প্রাণি, গাছপালা দেখার সুযোগ করে দেওয়া দরকার।

প্রাক্ সক্রিয়তার স্তর (Pre-operational Stage) :

দ্বিতীয় স্তরটির নাম প্রাক্ সক্রিয়তার স্তর (Pre-operational Stage)। দুই বৎসরের পর থেকে ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত এই স্তরের স্থায়ীত্ব। এই স্তরে সংবেদন-সঞ্চালন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেখার পাশাপাশি আরও নতুন প্রক্রিয়া যুক্ত হয়। এখানে সক্রিয়তা

শব্দটির অর্থ শারীরিক কর্মচঞ্চলতা নয়, মানসিক সক্রিয়তা। অর্থাৎ এই পর্যায় থেকে শিশুরা যা দেখেছে, বা যা সঞ্চালন ক্রিয়ার সাহায্যে শিখেছে তার একটি মানসিক প্রতিরূপ তৈরি করতে শুরু করে। এই বয়সে তাদের কথা বলা ও ভাষাবোধের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। সুতরাং স্কিমার মানসিক প্রতিরূপটিতে নতুন নতুন তথ্য যুক্ত হয়ে দ্রুত তার প্রসারণ ঘটে। কিন্তু বাইরের জগৎকে সে বড়দের মত যুক্তি ও তথ্য দিয়ে বিচার করে না। তার চিন্তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হল।

- এই প্রথম শিশু তার কল্পনার জগৎ ও বাস্তব জগৎকে আলাদা করে।
- কিন্তু এই বয়সে তার চারপাশের পুতুল, আসবাব, গাছপালা সবই তার কাছে সজীব কথা বলা প্রাণি।
- এই সময় তার যুক্তিবোধ সম্পূর্ণ নিজস্ব। যেমন, রাত্রির পর সকাল হয় কারণ পাখিরা ডাকে।
- ছোট বড়, কম বেশি ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা একটা মাত্র তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। যেমন, যে লম্বা সে বড়, যার চুল পাকা সে দাদু ইত্যাদি।
- আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা বেশি থাকে। সে মনে করে সবকিছুই তাকে কেন্দ্র করে ঘটেছে। আমি, আমার এই জাতীয় কথা বেশি ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়।
- এদের চিন্তা একমুখি। ক থেকে খ বড়, কিন্তু এর বিপরীতভাবে খ থেকে ক ছোট বলতে পারে না।

এদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় কাজে লাগানো যেতে পারে।

- এরা নার্সারি বা কিন্ডারগার্টেন স্কুল থেকে ফিরে শিক্ষিকার অনুকরণে স্কুল স্কুল খেলতে ভালোবাসে।
- খেলার সময় নানারকমভাবে বাস্তবের অনুকরণ করতে পারে। যেমন, খাওয়া বা ঘুমের ভান করা।
- ছবি আঁকার ঝোঁক দেখা যায়।
- ভাষা এদের চিন্তার বাহন। যা করে বা ভাবে তা মুখে বলতে বলতে করে।
- সবকিছুর একটা মানসিক ছবি আঁকতে চেষ্টা করে।

এই সব কারণে এদের শেখানোর জন্য উজ্জ্বল ছবি, নাচ-গান সহ ছড়া, আবৃত্তির মাধ্যমে নতুন তথ্য দেওয়া ইত্যাদি বিশেষ কার্যকর। তাছাড়া সংবেদন সঞ্চালনস্তরের উপযোগী অভিজ্ঞতালাভের সুযোগও থাকা দরকার।

মূর্ত সক্রিয়তার স্তর (Concrete operational stage)

এটি তৃতীয় স্তর। এর স্থায়ীত্বকাল ৭-১১ বৎসর। এই সময়ে শিশুদের মানসিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ যুক্তি নির্ভর না হলেও তার ভিত্তি তৈরি হয়। তারা শ্রেণিবিভাগ করতে শেখে। যে সব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করা হয় সে সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে। সেই সঙ্গে ক্রমশ উপলব্ধি করে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একই বস্তু একাধিক শ্রেণির অন্তর্গত হতে পারে। যেমন, একই মানুষ কারও বাবা কিন্তু অন্য একজনের ভাই হতে পারে। এই সময়ে সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা, গণনার জন্য সংখ্যার ক্রমিক অবস্থান, সংখ্যার সংযোজন ও বিয়োজন সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার শেখা হয়ে যায়। এই কারণে এই বয়সের শিশুদের (প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার বয়স) গণিতের মৌলিক নিয়মগুলি যেমন, যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ শেখানো হয়। স্থান সম্বন্ধেও তাদের বিমূর্ত্ত মানসিক প্রতিরূপ তৈরি হয়। সেজন্য কিছু কিছু স্থানীয় ভৌগোলিক শিক্ষা এদের উপযোগী।

তবে যাই শিখুক, বা যাই শেখানো হোক প্রথম প্রথম তার একটি বাস্তব বা মূর্তরূপ থাকা দরকার। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই তার মানসিক প্রতিরূপটি তৈরি হয়। যোগ বিয়োগ শেখানোর জন্য এই কারণেই প্রথমে সংখ্যার পরিবর্তে পুঁতি, মার্বেল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এরা অংশ ও সম্পূর্ণ বস্তুর পার্থক্য বুঝতে পারে এবং দুটি বা তিনটি ভাঙ্গা অংশ একত্রে যুক্ত হলে যে একটি সম্পূর্ণ জিনিস হয় সেই বোধ এদের মধ্যে তৈরি হয়।

প্রাথমিক শিক্ষকরা কয়েকটি নীতি অনুসরণ করলে এই স্তরের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করা সহজ ও কার্যকর হবে।

- ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত বাস্তব অভিক্ষতাকে যথাসম্ভব কাজে লাগানো দরকার।
- বই থেকে নয়, প্রকৃত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শেখানো সহজ।
- বাস্তব (মূর্ত) থেকে ক্রমশ যুক্তিনির্ভর (বিমূর্ত) ও মানসিক প্রতিরূপ সৃষ্টির মাধ্যমে স্কিমার গঠন প্রসারিত হবে।
- শ্রেণিবিভাগ করতে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা দরকার। নানাভাবে শ্রেণিবিভাজন, যুক্তির বিকাশে সাহায্য করে।
- নিজের গ্রাম, অঞ্চল ইত্যাদি ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে শেখান। এর ফলে তাদের স্থানিক প্রত্যক্ষণ ও ধারণা গঠন সহজ হবে।
- বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে পড়ানো দরকার।
- শেখানোর চেয়ে নিজে শেখার উৎসাহ দিতে হবে।
- যতদূর সম্ভব হাতে কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে, নিজের উদ্যোগে তথ্য সংগ্রহ করে শেখার উৎসাহ দিতে হবে।

যৌক্তিক সক্রিয়তার স্তর (Formal Operational Stage)

পিয়াজেঁর তত্ত্বে চতুর্থ স্তরটির নাম যৌক্তিক সক্রিয়তার স্তর। এ শুরু ১১-১২ বৎসর বয়সে এবং সমগ্র কৈশোর কাজ যাবৎ এর বিকাশ হয়। এই সময় ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ যুক্তিনির্ভর শিখনে অভ্যস্ত হতে থাকে। যদি পূর্ববর্তী তিনটি স্তরের শিখন প্রক্রিয়া যথাযথ হতে থাকে তবে তারা এই সময় বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা ও তথ্যের সত্যতা যাচাই করে নিতে সচেষ্ট হয়। এই কারণে সপ্তম শ্রেণির পর থেকে পাঠ্য বিষয়ে ক্রমশ বেশি করে বিমূর্ত চিন্তা, যুক্তি ও বিশ্লেষণের প্রাধান্য দেখা যায়। যেমন, বীজগণিত পাঠের সূত্রপাত, জ্যামিতি উপপাদ্যের যুক্তি নির্ভর প্রমাণ, কবিতার মর্ম ও সৌন্দর্য বিচার, প্রবন্ধের মাধ্যমে কোন বিমূর্ত বিষয়ের আলোচনা ইত্যাদি পাঠক্রমে স্থান করে নেয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে পূর্ববর্তী তিনটি স্তরের শিখন প্রক্রিয়া কখনই লোপ পায় না।

পিয়াজেঁর তত্ত্ব যদি আমাদের বৌদ্ধিক বিকাশ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তবুও শিশুদের শিখন প্রক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে এ অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্যই ক্লাসের শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠক্রম রচনায় পিয়াজেঁর চিন্তাধারা প্রয়োগ করা একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

- **নিজ অগ্রগতি যাচাই (Check your progress):**

  (i) আধুনিক শিক্ষার জনক কে?

  (ii) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জনক কে?

  (iii) কিন্ডারগার্টেন কে প্রতিষ্ঠা করেন?

  (iv) পিঁয়াজের গবেষণার মূল বিষয় কী?

  (v) ‘‘শিক্ষাই জীবন’’ কে বলেছেন?

  (vi) রুশো মানবজীবনের কয়টি স্তরের কথা বলেছেন?

  (vii) ‘এমিল’ কার মানসপুত্র?

● **শিখনের ফলাফল (Learning outcome):**

(i) মানব উন্নয়নের স্তর সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হবেন।

(ii) ডিউই -এর শিখন পদ্ধতির বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে জানতে সমর্থ হবেন।

(iii) ফ্রয়েবেলের পাঠক্রম বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

(iv) মন্তেসরি কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সমর্থ হবেন।

(v) পিঁয়াজে বর্ণিত শিখন প্রক্রিয়ার স্তরগুলি জানবেন।

৫.৪ সারাংশ (Summary)

প্রাচ্য চিন্তাবিদগণ যেমন — মহাত্মা গান্ধী, শ্রী অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ এবং পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদগণ যেমন— রুশো, ডিউই, ফ্রয়েবেল, মাদাম মন্তেসরি, পিঁয়াজে প্রমুখের জীবনদর্শন, শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, ভালবাসা, নতুন নতুন শিক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবন মানবজাতির কল্যাণে সারা জীবন ধরে কাজের কথা জানবেন। আগামী প্রজন্মও এই চিন্তা শক্তি ও আদর্শের উপরে গড়ে উঠবে এই আশা প্রত্যেক ভারতবাসী তথা সারা বিশ্বের।

তাই তাঁদের জীবনদর্শন, মতাদর্শ, শিক্ষার জন্য নির্মিত পথ আমরা অনুসরণ করব এই অঙ্গীকার আমরা এই পাঠ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে রাখব।

৫.৫ অনুশীলনী (Exercise)

(i) বুনিয়াদি শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

(ii) শ্রী অরবিন্দের শিক্ষার মূল লক্ষ্য কী ছিল?

(iii) শিক্ষা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান আলোচনা করুন।

(iv) শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও নারীর উন্নয়নে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা উল্লেখ করুন।

(v) কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির স্রষ্টা কে? এবং তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতির বর্ণনা করুন।

(vi) পিঁয়াজের প্রজ্ঞামূলক তত্ত্বটি কী ? ব্যাখ্যা করুন।

(vii) ডিউই -এর শিক্ষার দর্শনও শিক্ষার লক্ষ্য কী ছিল?

(viii) ফ্রয়েবেলের শিক্ষার লক্ষ্যগুলি লিখুন।

(ix) রুশোর শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে লিখুন।

৫.৬ তথ্য উৎস (Reference)

1. Great Education – K. K. Mukherjee
2. Great Educators – Rusk.
3. শিক্ষায় পথিকৃৎ - বিভূরঞ্জন গুহ

অধ্যায় ৬

শিক্ষা রাজনীতি এবং সমাজ
(Education, Politics and Society)

৬.১ সূচনা (Introduction)

প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় রাজা-মহারাজাগণ প্রত্যক্ষ বা সরাসরি শিক্ষার উপর হস্তক্ষেপ না করলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য জমিদান এবং পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁদের যথেষ্ট সহযোগিতা ছিল।

মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থায় ''ইসলামি শিক্ষার'' প্রাধান্য দেখা যায়। এই সময়ের সুলতানি শাসকগণ কেবলমাত্র ইসলামি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইসলামি বা মুসলিম শিক্ষা প্রবলভাবেই রাজশক্তি নির্ভর থাকায় শিক্ষাব্যবস্থার উপর রাজনৈতিক প্রভাব দেখা যায়।

আধুনিক যুগের প্রথমদিকে ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার শিকার হয়। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার নগ্নরূপের সঙ্গে ভারতবাসী পরিচিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী দীর্ঘদিন শাসনব্যবস্থা কায়েম করার পর বুঝতে পারে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করার জন্য এবং তা স্থায়ী করার জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন তা প্রচলন করা। দেশজ শিক্ষাব্যবস্থাকে দুর্বল করে ''চুঁইয়ে পড়া শিক্ষানীতি'' এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন করা।

৬.২ সমাজে প্রান্তিক মানুষদের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম ও শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education in reproducing dominance and challenging marginalization with reference to class, caste, gender and religion)

ভারতীয় সমাজের মূলস্রোতের মানুষগুলি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই দেশীয় সম্পদের বেশিরভাগ অংশের কর্তৃত্ব ধরে রাখে। এই মূলস্রোতের মানুষরা তাদের পরিচয় খুঁজে পেয়েছে তাদের বংশ পরিচয়, সামাজিক মর্যাদা, ব্যক্তিগতভাবে অর্জিত গুণাবলির মধ্যে, যা প্রধান এবং প্রাথমিক পরিচয় হয়ে ওঠে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক পরিচয়কে কেন্দ্র করেই গোষ্ঠীবদ্ধ হয় একদল মানুষ। চিরকাল ধরেই বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই শক্তিশালী গোষ্ঠী প্রভুত্ব করে আসছে। এই সময় আবার কিছু মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন প্রভুত্ব করার উপযুক্ত সম্পদ তাদের কাছে না থাকার জন্য। এই রকম সামাজিক অবস্থায় শিক্ষা বিশেষভাবে সম্পদ সৃষ্টির কাজে সহায়তা করে, যাতে প্রভুত্ব না করতে পারা মানুষগুলি তাদের অস্ত্র ফিরে পায় সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসার জন্য। সাধারণভাবে যে যে কারণে এই বিচ্ছিন্নতা দেখা যায় সেগুলি হল — সামাজিক শ্রেণি, জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম ইত্যাদি। এদিকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যার মূলমন্ত্র হল সকলের জন্য সমান সুযোগ। বিশেষ করে শিক্ষায় সমসুযোগ।

সারা পৃথিবী জুড়েই বিভিন্ন দেশে এই বিচ্ছিন্নতাও যেমন প্রবল, শিক্ষার সমসুযোগের দাবিও তেমনি আবহমানকালের। একবিংশ শতকে এসে এই দাবি কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। এটি শুধু সমসুযোগ অর্থাৎ ভর্তির কারণে সুযোগ পাওয়া নয়, সকলের জন্য সমমানের শিক্ষার জন্য।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে— আমাদের দেশে জাতপাত বা অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতিগত/বর্ণগত কারণে, দক্ষিণ এশিয়ার কোনো কোনো দেশে লিঙ্গগত কারণে কেউ কেউ পিছিয়ে আছেন। সব দেশই চেষ্টা করছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দেশ ও সহযোগিতায় সকলের জন্য শিক্ষা (EFA)-র ব্যবস্থা করতে। এখন শুধু ''Education for All'' নয় ''Quality Education for All''— এটাই শিক্ষার দাবি যা সমাজে বিচ্ছিন্নতা দূর করে সকলকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে পারে।

ঘটনাসমীক্ষা : ১

ঝাড়গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় যেখানে মাতৃভাষা বাংলা সেখানে বসবাসকারী শিশু, মতি বাড়িতে যে ভাষায় কথা বলে সেটিও বাংলা। কিন্তু পাঠদানের সময় বাংলা ভাষার যে রূপটি থাকে, তার কাছে তা অপরিচিত। এক্ষেত্রে ছেলেটিকে শিক্ষালাভের অধিকার দেওয়া গেলেও তার পরিস্থিতি বা চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার অভাব থেকেই গেল। সে শ্রেণিকক্ষে প্রথমে বিচ্ছিন্ন হল তারপর ধীরে ধীরে শিক্ষার জগৎ থেকে পিছিয়ে এল।

এখানে শিক্ষার কোন ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত?

মতির কথ্য ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূলভাষার সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে হবে। তবে সে এখানে আনন্দ খুঁজে পাবে এবং একই সঙ্গে শিক্ষালাভের অগ্রগতি সহজে সম্পন্ন হবে। শিশুর অধিকার ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে জাতীয় কমিশন (NCPCR) যে নতুন শিক্ষানীতি (২০১৬)-তে প্রকাশ করেছে তার ১০ নম্বর চিহ্নিত বিষয়টি হল অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা— তফাসিলি জাতি, উপজাতি, মহিলা, সংখ্যালঘু এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সুযোগদান। এর মূল বক্তব্যটি হল—

(ক) বিদ্যালয়কে সকলের জন্য সমান এবং নিরাপদ শিখনের আবহ তৈরি করা। যে-কোনো পারিবারিক প্রেক্ষাপট থেকে এসেই শিক্ষার্থী সহজেই যেন ওই পরিবেশে যুক্ত হতে পারে। লিঙ্গগত, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিগত বিভাজন না প্রকাশ পায়।

(খ) শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্য বহুমুখীনতা সম্পর্কে শিক্ষককে বিশেষভাবে সংবেদনশীল হতে হবে।

(গ) সমস্ত সরকারি, বেসরকারি সংস্থা একটি করে এলাকা চিহ্নিত করে গণচেতনা জাগ্রত করার দায়িত্ব নেবে যাতে দৈহিক অসমর্থ শিশুরা যথাযথ পুনর্বাসন লাভ করতে পারে।

(ঘ) বহুসংস্কৃতির পদ্ধতিবিজ্ঞান গ্রহণ করে, যে কোনো স্বল্পসুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করতে হবে এবং আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে।

(ঙ) শিশুশ্রম, শিশুবিবাহ রুখতে প্রতিটি ০-১৮ বছরের শিশুকে চিহ্নিতকরণমূলক সংখ্যা (ID no) দিতে হবে যাতে সহজেই তাদের উপস্থিতি চিহ্নিত করা যায়।

(চ) বিদ্যালয়ের বাইরের সব শিশুদের পুনর্বাসন সুনিশ্চিত করতে হবে।

(ছ) প্রধানমন্ত্রী ফসল যোজনার টাকায় অন্তত একবছরের জন্য কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে, যখন শস্য উৎপাদনের ঘাটতি হবে তখন যাতে কোন অসুবিধা না হয়।

(জ) গরমের ছুটিতে খরা অধ্যুষিত অঞ্চলে মিড্-ডে মিল দেওয়া হবে।

(ঝ) কোনো বিদ্যালয় তখনই সংখ্যালঘু পরিচালনার আওতায় আনা হবে যখন সেখানকার অধিকাংশ শিক্ষার্থী সংখ্যালঘু হবে। শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষ সংখ্যালঘু বলেই এই মর্যাদা দেওয়া হবে না।

২০১৬ সালের এই নয়া শিক্ষানীতিতে অনেকগুলি সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের দিশা থাকলেও এর রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন আন্তরিক মনোভাব ও সর্বস্তরের প্রচেষ্টা। এই নীতিগুলিকে সফল করার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি হল—

(ক) পাঠক্রম ভাবনার মধ্য বহু সংস্কৃতির মূল্যবোধ যুক্ত করা।

(খ) শ্রেণিকক্ষের সংস্কৃতিকে আরো কর্মমুখী করা তোলা যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারে।

(গ) প্রতিটি শিশু যাতে তার জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠ্যবস্তুকে যুক্ত করতে পারে।

(ঘ) শিক্ষককে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে— জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ-ভাষা-অর্থনৈতিক অবস্থা বাসস্থান প্রভৃতি নির্বিশেষে প্রতিটি শিশুই বিচারশীল চিন্তক (Critical Thinker) হয়ে উঠতে পারে, যদি তেমন সুযোগ তাকে তৈরি করে দেওয়া যায়।

অগ্রগতি যাচাই :

ক) কী কী কারণে সমাজে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হতে পারে উদাহরণ দিয়ে বোঝান।

খ) সকলকে সমাজের মূলস্রোতে আনতে শিক্ষকের দায়িত্বগুলি কী কী?

৬.৩ শ্রেণি, জাতি, লিঙ্গ এবং ধর্মের দিক থেকে প্রবলভাবে পিছিয়েপড়া মানুষের ক্ষমতায়নে শিক্ষার ভূমিকা (Role of education in reproducing dominance & challenging marginalization with reference to class, caste, gender and religion)

উদ্দেশ্য :

(১) পিছিয়েপড়ার কারণ সম্পর্কে জানা।

(২) পিছিয়েপড়ার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারা।

(৩) শিক্ষার উন্নয়নে ও ক্ষমতায়নে পিছিয়েপড়া সম্প্রদায়ের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারা।

সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় সমাজে শ্রেণিভেদে, জাতিভেদে, লিঙ্গভেদে এবং ধর্মীয় কারণে বৈষম্য দেখতে পাওয়া যায়। একবিংশ শতাব্দীতে উপনীত হয়েও এর করাল গ্রাস থেকে ভারতীয় সমাজ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেনি। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হওয়ায় হীনমন্যতার শিকার হয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে এই সমস্যার চির অবসানের জন্য সংবিধানে কিছু ধারার মাধ্যমে এর প্রতিকার বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি এর ফল আশানুরূপ না হওয়ার অন্যতম কারণ হল সঠিক শিক্ষার অভাব। শিক্ষা ব্যতীত এদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কোনোটাই সম্ভব নয়। সমাজের এই অবহেলিত অংশ যাতে নিজেদের অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ হতে পারে, তার একমাত্র হাতিয়ার হল শিক্ষা। সমাজের এই অংশের পিছিয়ে পড়ার কারণ নানাবিধ যা নিম্নে আলোচিত হল।

- **পিছিয়েপড়ার কারণ**
  - (ক) ব্যক্তিকেন্দ্রিক কারণ ও
  - (খ) কমিউনিটিকেন্দ্রিক কারণ

(ক) ব্যক্তিকেন্দ্রিক কারণ

প্রথমত : দীর্ঘদিন ধরে উচ্চশ্রেণির মানুষের দ্বারা SC, ST অর্থাৎ পিছিয়েপড়া বর্গের মানুষেরা অবহেলিত অত্যাচারিত। ফলে হতভাগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে হীনমন্যতা দেখা দিয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত : এছাড়া পিছিয়েপড়া বর্গের মানুষের মধ্যে শিক্ষার সচেতনতার খুবই অভাব। ফলে এদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে পারে না।

তৃতীয়ত : এই শ্রেণির জনগণ অনেকেই প্রথম জন্মের শিক্ষার্থী (First Generation learner)। নানাবিধ প্রতিবন্ধকতায় তার পরীক্ষার ফল নেতিবাচক হলে সে অনেকাংশেই পাঠত্যাগ করে।

চতুর্থত : বৌদ্ধিক কারণ - বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার পরে যে সমস্ত শিশুদের বুদ্ধ্যাঙ্ক ৭০ থেকে ৮০-র মধ্যে পড়ে তাদের পিছিয়ে পড়া শিশু বলা যায়।

পঞ্চমত : প্রাক্ষোভিক কারণ - অনেক আবেগপ্রবণ শিশুর মানসিক স্থৈর্য্যের অভাব আছে। পুরস্কার, তৈরস্কার, অনুভূতি তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। আবার কেউ খুব দ্রুত বা খুব ধীরগতি হওয়ায় পাঠ গৃহান বিচ্যুতি দেখা যায়। অনেকে বিষম বয়সীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে এক একগুঁয়ে, জেদী ও মিথ্যাবাদী হওয়ায় পাঠগৃহান পিছিয়ে পড়ে। অনেকে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগী মনোভাব নিয়ে নি:সঙ্গ হয়ে পড়ে। তার ফলে শ্রেণীর সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পাঠ গৃহান অক্ষম হয়ে পড়ে।

যষ্ঠত : শারীরিক কারণ - দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি কম, বাস্তবিক ক্ষমতা ত্রুটিপূর্ণ। প্রায়শই শারীরিক অসুস্থতায় ভুগলে এবং শারীরিক বৈকল্য থাকলে সকলের সঙ্গে একই হারে পড়াশুনা করা সম্ভব নয়। শারীরিক অসুস্থতা বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির অন্যতম কারণ হতে পারে।

(খ) কমিউনিটিকেন্দ্রিক কারণ বা সমাজকেন্দ্রিক কারণ—

(১) পারিবারিক কারণ :

- **দারিদ্র্যতা —** পশ্চাৎপদ জনগণের একটা বড় অংশ দরিদ্র। উপার্জনভিত্তিক কাজে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষা অবহেলিত।
- সময়াভাব, অজ্ঞতা, শিশুর প্রতি নজর না দেওয়ার মানসিকতা, উপযুক্ত গৃহপরিবেশ ও গৃহশিক্ষাকর অভাব। শিক্ষা সহায়ক সরঞ্জামের অভাব, শিশুকে গৃহকর্মে নিযুক্ত রাখা, ফলে উপযুক্ত শেখার সময়াভাব শিক্ষা গৃহণের প্রতি কুপ পরিবেশ সৃষ্টি করে। পশ্চাৎপদ জনগণের একটা বড় অংশ দরিদ্র। উপার্জনভিত্তিক কাজে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষা অবহেলিত।
- **শিক্ষার প্রতি আগ্রহের অভাব —** SC, ST এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণির পরিবারের অধিকাংশেরই শিক্ষার প্রতি আগ্রহের অভাব দেখা যায়। কারণ পরিবারের কর্তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিরক্ষর।
- **শিক্ষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা —** উচ্চ ও মধ্যশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। নিম্নশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তা দেখা যায় না।
- **সমবায়মূলক ভূমিকা পালনে অক্ষমতা —** শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতা এবং প্রকৃত ছাত্রের ভূমিকা পালন করা অপরিহার্য। এর জন্য প্রয়োজন হল পিতামাতা বা অভিভাবকের পরামর্শ এবং উৎসাহ দান। যা নিম্নশ্রেণিভুক্ত পরিবারের পিতামাতা সঠিকভাবে পালন করতে অক্ষম।

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামাজিক পরিবেশ :

(ক) **পার্থক্যকরণ ঃ** SC, ST এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ ব্যক্তি অধ্যুষিত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের প্রচণ্ড অভাব দেখা যায়।

(খ) শিক্ষকদের একটা বড় অংশ পশ্চাৎপদ শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনা হেয় চোখে দেখে।

গ) **SC, ST এবং OBC-দের প্রতি উচ্চশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি —** শিক্ষকগণ মনে করেন যে, সাধারণ শ্রেণিভুক্ত ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে SC, ST-রা সর্বদাই পিছিয়ে পড়ে বা পিছিয়ে থাকে। কারণ বর্তমান পাঠক্রম উচ্চ ও মধ্য শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থীদের প্রেক্ষিতেই রচিত হয়।

- **সামাজিক অসমতা :** সামাজিক অসমতার কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণিভুক্ত জনগণ পিছিয়ে আছে। আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদায় পিছিয়ে থাকায় তারা সামাজিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে।

● **পিছিয়েপড়ার কারণ বিশ্লেষণ :** শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণ মনে করেন এখনও মধ্যশ্রেণির আশা আকাঙ্খা অনুযায়ী শিক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠেছে। নিম্নশ্রেণিভুক্ত জনগণের চাহিদা বা আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় না। পাঠক্রম, মূল্যায়ন পদ্ধতি, সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলি এবং শিক্ষার সাধারণ পরিবেশ নিম্নশ্রেণিভুক্ত জনগণের শিক্ষা ও বৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী রূপ পায় না। যার ফলে SC, ST বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, প্রেষণা এবং দায়বদ্ধতার অভাব দেখা যায়।

- **পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে এবং উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা ঃ (Role of Education in Development of Backward Communities)**
- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত ঃ**

(i) মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমের বহুমুখীকরণ এবং অল্পসময়কালীন বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা।

(ii) কোর্স নির্বাচনে স্বাধীনতা দান।

(iii) গ্রামীণ এলাকায় বেশি করে পলিটেকনিক এবং বৃত্তিমুখী কলেজ খোলা।

(iv) সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও নিশ্চিত করা।

(v) বয়স্কশিক্ষা, প্রথাবহির্ভূত এবং মুক্তশিক্ষাকে আরও সম্প্রসারিত করা, পাশাপাশি এর গুণগত মান উন্নত করা।

- **পিতা-মাতা সংক্রান্ত ঃ**

(i) পিতা-মাতাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং এব্যাপারে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা।

(ii) 'Right to Education Act' (শিক্ষার অধিকার আইন) সম্পর্কে পিতা-মাতাদের অবহিত করতে হবে।

(iii) পিতা-মাতারা যাতে ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করতে পারে সে সম্পর্কে সচেষ্ট হতে হবে।

- **সরকারি বিষয় সংক্রান্ত :** উপযুক্ত শিক্ষক, ভাল হোস্টেল, বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ, সরকারিবৃত্তি, বিদ্যালয়-এর পরিকাঠামোগত উন্নতি করতে হবে।

- **শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত ঃ** পশ্চাৎবর্তী এবং পশ্চাৎবর্তী নয় এমন উভয় দলের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াকে উৎসাহিত করতে হবে। যাতে সমাজে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ পারস্পরিক মর্যাদা প্রদান করতে পারেন বিভিন্ন আলাপচারিতায়।

এছাড়া শিক্ষক অভিভাবকের সঙ্গে সহানুভূতিমূলক আলোচনার দ্বারা বাড়ীতে এবং বিদ্যালয়ে তিনি নিজে অধিকতর অনুশীলনে উদ্যোগী হবেন। অধিকতর সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করবেন। অঙ্গ সঞ্চালনমূলক কাজে গুরুত্ব দেবেন যাতে আগ্রহ কেন্দ্র সচল হয়। (যেমন- আঁকা, নাচ, গান, মাটি, কাগজ ও পাতার কাজ)

- **আমলাতান্ত্রিকতা ঃ**

(i) সকল আধিকারিক এবং অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করবেন এবং উক্ত জনগণের জন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধাগুলো সম্পর্কে পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর মানুষদেরকে অবহিত করাবেন।

(ii) সুযোগ-সুবিধা পাবার জন্য সহজ ভাষা প্রয়োগ করে ফর্ম পূরণের ব্যবস্থা করবেন এবং আবেদনপত্র পূরণে (প্রয়োজনে) সহায়তা করবেন।

- **নিজ অগ্রগতি যাচাই**

(i) পিছিয়েপড়া বর্গ বলতে কাদের বোঝানো হয়?

(ii) পিছিয়েপড়ার কারণ কী কী?

(iii) মানুষের বা সম্প্রদায়ের পশ্চাৎপদতার কারণ কী?

(iv) কীভাবে পিছিয়েপড়া বর্গের উন্নতি ঘটানো যায়?

- **শিখনের ফলাফল**

(i) পিছিয়েপড়ার কারণ জানতে পারবে।

(ii) শিক্ষা কীভাবে পিছিয়েপড়া বর্গের মানুষের উন্নতিসাধন করতে পারে সে সম্পর্কেও অবগত হবে বা জানতে পারবে।

৬.৪ শিক্ষক ও সমাজ (Teacher & Society)

উদ্দেশ্য :

(a) সামাজিক কল্যাণে শিক্ষকের ভূমিকার বিশ্লেষণ করতে পারা।

(b) শিক্ষকের মর্যাদার বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন করতে পারা।

(c) সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষকের ভূমিকা জানতে পারা।

- **সামাজিক কল্যাণে শিক্ষকের ভূমিকা :**

  শিক্ষক কিছু নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজ কল্যাণের ভূমিকা পালন করে থাকেন, সেগুলি হল :

  - সামাজিক চাহিদানুযায়ী পাঠক্রমকে স্থির করতে হবে।
  - বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এর মাধ্যমে সাহচর্য বাড়তে পারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে।
  - বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে পারেন বিদ্যালয়ে।
  - বিদ্যালয়ে বিভিন্ন উৎসব, মহাপুরুষের জন্মদিন পালন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে পারেন।
  - বয়স্কদের জন্য বিদ্যালয়ে পৃথক গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করে রাতেও খোলা রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন।
  - শিক্ষক-অভিভাবক সংস্থা নির্মাণ করতে পারেন।
  - সাক্ষরতার প্রচার বাড়িয়ে মানুষের মধ্যে সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে পারেন।
  - শেষ বয়সে বিদ্যালয়ে যাতে অর্থবহভাবে সময় কাটাতে পারেন শিক্ষার্থীরা তেমন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা তৈরি করতে পারেন।

- **শিক্ষকের মর্যাদার বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন :**

1983 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে Govt. of India বিদ্যালয় এবং কলেজ স্তরে দুটি "National Commissions of Teacher" গঠন করেন। কমিশন কয়েকটি বিষয়ে মন্তব্য করেন - শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি এবং অবসর সময় অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা হলেও পেশাগত গুরুত্ব এবং তাদের মর্যাদা অনুযায়ী বেতনের পরিমাণ আশানুরূপ ছিল না। এজন্যই ভাল মেধাসম্পন্ন শিক্ষকেরা শিক্ষকতার পেশায় আসছিল না। মাঝারি মেধাযুক্ত যুবক-যুবতিরাই এই পেশায় অধিক দেখা যাচ্ছিল। ফলে শিক্ষকরা মর্যাদার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল।

1986 সালে জাতীয় শিক্ষানীতির নবম অধ্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি বিষয়ের উপর নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় :

  - শিক্ষকদের বেতন ও চাকুরির শর্তাবলি তাদের সামাজিক এবং পেশাগত দায়িত্বের সঙ্গে সংগতি রেখেই নির্ধারণ করা হবে।
  - শিক্ষকদের জন্য খোলাখুলি অংশগ্রহণমূলক ও তথ্যভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং যুক্তি সংগ্রহের সুযোগের মাধ্যমে সাহায্যে প্রমোশনের মাধ্যমে শিক্ষকদের কৃতিত্বের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে।
  - শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক সংঘ, National Code of Professional Ethics বা পেশাগত নৈতিকতার জাতীয় নিয়মাবলি তৈরি করা হবে। সর্বভারতীয় শিক্ষা সার্ভিস কমিশন তৈরি, একইরকম বেতন হার তৈরি করা সকল শিক্ষকদের জন্য চাকুরির শর্ত ও চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থাও রাখা হবে।

- **সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষকের ভূমিকা :**

আমেরিকান বিজ্ঞানী Gordon-এর মত অনুসরণ করে বলা যায়, শিক্ষার কাজ হল শিক্ষা দেওয়া— পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা দেওয়া-পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া—পরিকল্পিত সমাজ বিপ্লবের জন্য শিক্ষা দেওয়া এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান করা। একজন শিক্ষক নিম্নলিখিত পন্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান, পরস্পর প্রীতির মনোভাব এবং দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারেন —

  - সরাসরি/প্রত্যক্ষ শিক্ষণের মধ্য দিয়ে।

- শিক্ষার্থীর গণতন্ত্র, ধর্মনির্দেশনা ও সমাজবাদের শিক্ষা বা মূল্যবোধ নির্মাণের সুযোগের মাধ্যমে।
- মূল্যবোধের নির্মাণের মাধ্যমে প্রত্যেককে আদর্শ প্রতিরূপ হিসাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে।

এছাড়াও

- সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সমস্যা নিরসনে শিক্ষক সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।
- পরিবেশ দূষণ, নিরক্ষরতা, বেকার সমস্যা, জনবিস্ফোরণ, পণ-প্রথা, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, সামাজিক অনৈক্য, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, ক্ষুদ্র আঞ্চলিক স্বার্থ তথা আঞ্চলিকতাবাদ অনুন্নত বা পিছিয়েপড়া শ্রেণির সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষকদের সচেতনতা ও
- সাধারণ পাঠক্রমের সঙ্গে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার শিখনকে সংযুক্ত করেও সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেন শিক্ষকরা।
- **নিজ অগ্রগতি যাচাই :**

(i) সমাজ কল্যাণে শিক্ষকের ভূমিকা কী?

(ii) শিক্ষকের ভূমিকা আসলে শিক্ষাক্ষেত্রে কী?

(iii) সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষকের ভূমিকা কী?

(iv) সামাজিক মান উন্নয়নে বা শিক্ষার্থীর সঠিক উন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকা কী?

শিখনের ফলাফল ঃ

(i) সমাজকল্যাণে শিক্ষকের ভূমিকা জানতে বা বুঝতে পারলাম।

(ii) শিক্ষকের মর্যাদার বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন করতে পারলাম।

৬.৫ সারসংক্ষেপ (Summary)

সাধারণভাবে মনে হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু শিক্ষার উপর রাজনীতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপ বা প্রভাব আছে এবং তা সর্বকালে সর্ব দেশে দেখা গেছে। রাজনৈতিক পরিবর্তনে শিক্ষারও পরিবর্তন ঘটে থাকে। প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ, ইংরেজি আমল তথা বর্তমানেও শিক্ষায় রাজনীতির প্রবেশ ঘটেছে। কেউ ব্যক্তিস্বার্থে ঘটিয়েছে আবার কেউবা সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ায় প্রবেশ ঘটিয়েছে। যাইহোক তবুও যতটা সম্ভব রাজনীতির প্রভাব মুক্ত করে শিক্ষাকে গড়ে তুলতে হবে **আধুনিক** ও **গণতান্ত্রিক** উপায়ে।

৬.৬ অনুশীলনী (Exercise)

(i) গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা আসলে কী?

(ii) পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে শিক্ষা কী ভূমিকা পালন করে?

(iii) সমাজবাদ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য কী?

(iv) সমাজের প্রতি শিক্ষকের দায়িত্ব কী?

(v) শিক্ষক কীভাবে সমাজকে গড়ে তুলবেন (আপনার মতে) ব্যাখ্যা করুন?

(vi) শিক্ষকের মর্যাদা কিসের উপর নির্ভর করে?

৬.৭ তথ্য উৎস (Reference)

(i) Modern Education - J. C. Chakraborty - K. Chakraborty Publishers

(ii) Philosophy and Principles of Education - A. Banerjee.B.B. Kundu

(iii) Sociology - D. Bhattarcharya - Bijoya Publisher.

অধ্যায়

৭

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো ও প্রক্রিয়া
(Structure and Process of Indian Education System)

৭.১ সূচনা (Introduction) :

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার গঠনগত দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখতে পাব বিদ্যালয় স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সরকারি, বেসরকারি বা সেবামূলক বিভিন্ন পরিচালনায় ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় Educational Functionaries বলতে অনেক কিছু বোঝালেও আলোচ্য অধ্যায়ে কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় ও সহশিক্ষকদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। বিদ্যালয় সহযোগী সংস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (NGO) Non-Governmental Organization, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, পৌরসভা, গ্রাম পরিচালন সমিতি ইত্যাদি। বিদ্যালয়কে আমরা সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ, সমাজের প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করে থাকি। তাই বিদ্যালয় সহযোগী সংস্থাগুলি বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকমের কার্যাবলি সারা বছর যাবৎ পালন করা হয়ে থাকে। এই কার্যাবলিগুলি স্থানীয় স্তর থেকে শিশুর মধ্যে জাতীয়তাবোধ বা আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগিয়ে তোলে। তাই সারা বছর এই activities গুলি পালনের ক্ষেত্রে নজর দেওয়া দরকার। ব্যক্তিগত বা সামাজিক প্রেক্ষিতের অপর দিক হল activities গুলি যথাযথ পালনের মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে নেতৃত্বদানের গুণগুলির বিকাশসাধন হয়। শিশুর মধ্যে সাংগঠনিক ও পরিচালনমূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৭.২ প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের শ্রেণিবিভাগ : (Types of Schools within different Administration bodies)

উদ্দেশ্য (Objectives) :

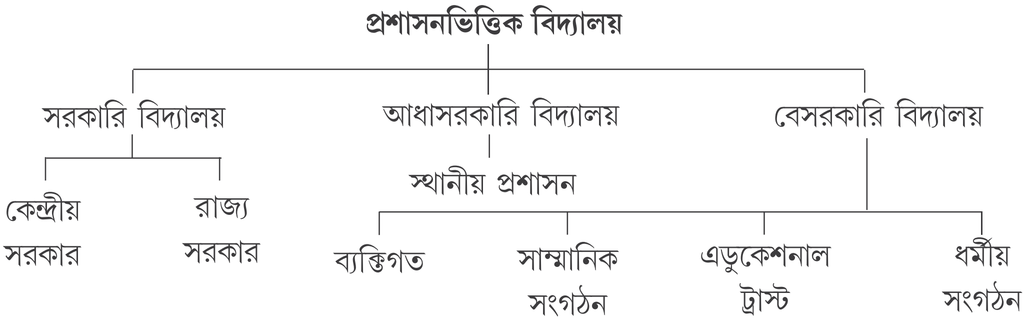

ফিফ্‌থ অল ইন্ডিয়া এডুকেশান সার্ভে — নির্ধারিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতবর্ষের বিদ্যালয়গুলিকে (NCERT 1989) উপরোক্ত নক্‌শা অনুযায়ী শ্রেণীভাগ করা হয়েছে।

(১) প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ।

(২) বিভিন্ন শ্রেণির বিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্যের ধারণা।

(১) প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ

- অল ইন্ডিয়া এডুকেশান সার্ভে নির্ধারিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতবর্ষের বিদ্যালয়গুলিকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
- **সরকারি বিদ্যালয় :** বিদ্যালয়ের সমস্ত দায়িত্ব সরকার বহন করে। শিক্ষকের বেতন, আনুষঙ্গিক খরচ কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে দেওয়া হয়। নিয়মকানুন, পাঠক্রম, পুস্তক সবই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সরকার এবং রাজ্য বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারই বহন করে।

- **বেসরকারি বিদ্যালয় :** সরকার কোনো আর্থিক সাহায্য করে না। বিদ্যালয় পরিচালনার উপর সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করে না। বিদ্যালয় পরিচালনার যাবতীয় খরচ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হয়। শিক্ষার্থীদের বেতন দিয়ে পড়তে হয়।

  এছাড়াও অন্য প্রকৃতির বেসরকারি বিদ্যালয় আছে যেমন —

  (ক) **ব্যক্তিভিত্তিক বিদ্যালয় :** এখানে ব্যক্তিই প্রধান। বিদ্যালয়ের যাবতীয় কিছু ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে। তবে ব্যক্তি হবে মানবদরদী এবং মানব কল্যাণই একমাত্র চিন্তা, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, ফ্রয়েবেল, মন্তেসরি এঁদের মধ্যে অন্যতম।

  (খ) **সামাজিক সংগঠনের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় :** অনেক সময় দেখা যায় কোনো সামাজিক সংগঠন, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা এনজিও (NGO) শিশুদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে দেয়।

  (গ) **ধর্মীয় সংস্থার দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় :** আমাদের দেশে বহু বিদ্যালয় আছে যারা পরিচালিত হয় ধর্মীয় সংস্থার দ্বারা। যেমন- রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমিলন মন্দির, মাদ্রাসা, চার্চ।

প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪১% পুরোপুরি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। ৪৭.৫% প্রাথমিক এবং উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্থানীয় প্রশাসন দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে এদের মধ্যে বেশি সংখ্যক বিদ্যালয় সরকারি অনুদান পায়। স্থানীয় প্রশাসন দ্বারা পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২% থেকে ৬%। প্রথাবহির্ভূত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মুক্ত বিদ্যালয় চালু করেছে। এই বিদ্যালয়গুলির আর্থিক দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার বহন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়গুলি স্বশাসিত। তাই পরিচালনার নিয়মাবলি স্থির করে। জাতীয় স্তরে মুক্ত বিদ্যালয়ের National Open School-এর সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করে। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে মুক্ত বিদ্যালয় চালু হয়। ২০০১ সালের আইন অনুযায়ী রবীন্দ্রমুক্ত বিদ্যালয় স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

(২) বিভিন্ন শ্রেণির বিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্যের ধারণা :

- **সরকারি বিদ্যালয় :** কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার শিক্ষকের বেতন, আনুষঙ্গিক খরচ, নিয়মকানুন, পুস্তক নিয়ন্ত্রণ করে তাকে সরকারি বিদ্যালয় বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীকে বেতন দিতে হয় না। কেন্দ্রীয় সরকারি স্কুলের উদাহরণ হল : পুরুলিয়া সৈনিক স্কুল, নবোদয় বিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ইত্যাদি। রাজ্য সরকারি বিদ্যালয়ের উদাহরণ হল : কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট বিদ্যালয়, বারাসাত গভর্নমেন্ট বিদ্যালয়।
- **বেসরকারি বিদ্যালয় :** এখানে শিক্ষার্থীকে বেতন দিয়ে পড়তে হয়। সরকার কোনো আর্থিক সাহায্য করে না। বিদ্যালয়ের পরিচালনের উপর সরকারি হস্তক্ষেপ থাকে না। বিদ্যালয় পরিচালনা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই করে থাকে।
- NGO ও সামাজিক বিভিন্ন সংগঠনও বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিচালনা করে থাকে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় স্থাপন, আর্থিক দায়ভার, পরিচালনা সবই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা করে থাকে।
- **ধর্মীয় সংস্থা :** আমাদের দেশে বহু বিদ্যালয় আছে যা পরিচালিত হয় ধর্মীয় সংস্থার দ্বারা। যেমন- রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মিলন মন্দির, মাদ্রাসা, চার্চ ইত্যাদি। এদের অনেকে সরকারি সাহায্য গ্রহণ করে আবার অনেক ধর্মীয় সংস্থা নিজস্ব সংগৃহীত অর্থেই বিদ্যালয় পরিচালনা করে।
- **অগ্রগতি যাচাই :**

  (i) বিদ্যালয় কত রকমের হয়?

  (ii) বেসরকারি বিদ্যালয় বলতে কী বোঝ?

  (iii) ধর্মীয় সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয়ের উদাহরণ দাও।

শিখন ফলশ্রুতি

আলোচ্য উপএকক অংশটি অধ্যয়ন করে কী কী জানবে—

১। শিক্ষার্থী শিক্ষক প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় সম্পর্কে বুঝতে পারবে।

২। শিক্ষার্থী শিক্ষক প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ের উদাহরণ দিতে পারবে।

৭.৩ শিক্ষামূলক কার্যকারিতার ভূমিকা ও দায়িত্ব (Roles & Responsibilities of educational functionaries)

উদ্দেশ্য : (Objectives) :

(১) প্রধান শিক্ষক, সহ শিক্ষক এবং অন্যান্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা (To develop the idea on the roles & responsibilities of head teacher & assistant teacher & others) :

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা :

প্রধান শিক্ষক মূলত একজন শিক্ষক। তাই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান তাঁর একটি বিশেষ দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা প্রধান শিক্ষকের সান্নিধ্যে আসে ও তাদের সমস্যার কথা সরাসরি জানতেও পারে। প্রধান শিক্ষকের পাঠদান অবশ্যই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে। যাতে করে অন্যান্য সহ শিক্ষকেরা ওই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করতে উৎসাহী হবে। প্রতিদিন প্রধান শিক্ষক ক্লাস নিলে ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত মান সম্বন্ধে অবহিত হতেও পারবেন। প্রধান শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যাতায়াতের ফলে বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

(১) **প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা :** যে কোনো প্রশাসনের মূল যন্ত্র হল যথাযথ পরিকল্পনা। তাই বিদ্যালয়কে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথাযোগ্য পরিকল্পনার প্রয়োজন।

(২) **পরিচালন সংক্রান্ত দায়িত্বের ধারণা :** বিদ্যালয়কে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে হলে অভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থাও সামঞ্জস্য পূর্ণ করতে হবে।

(৩) **তত্ত্বাবধানমূলক দায়িত্বের ধারণা :** কোনো কাজের অগ্রগতি যাচাই করার জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ হল তত্ত্বাবধান। তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে ব্যক্তিকে সাহস জোগানো, পরামর্শ দেওয়া এবং দিক নির্দেশনা করে থাকেন প্রধান শিক্ষক।

(৪) **পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্বের সম্পর্কে ধারণা :** প্রধান শিক্ষক পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন।

(৫) **নির্দেশনামূলক দায়িত্বের ধারণা :** প্রধান শিক্ষক নেতা হবার সুবাদে ছাত্র-ছাত্রী, সহকর্মীদের বিভিন্নভাবে নির্দেশনা দান করেন।

(৬) **প্রধান শিক্ষকের বিবিধ দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা :** অফিস, অর্থনৈতিক, বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ, পরিচালন সমিতির গঠন সংক্রান্ত কাজ, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত কাজ, শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কিত কাজ প্রধান শিক্ষক করে থাকেন।

(৭) কিছু কিছু সামাজিক কাজ ও দায়িত্বও প্রধান শিক্ষক মহাশয় করে থাকেন আঞ্চলিকভাবে।

সহ শিক্ষকের দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা

শিক্ষামূলক দায়িত্ব, নৈতিক ও চরিত্র বিকাশের দায়িত্ব, সম্পর্ক স্থাপনের ভূমিকা ও দায়িত্ব, শৃঙ্খলা স্থাপনের ভূমিকা এবং দায়িত্ব, মূল্যায়ন সম্পর্কিত দায়িত্ব, বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়নের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

অশিক্ষক কর্মচারী ও তার যথার্থ ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে থাকে শিক্ষাক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব রক্ষা, প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রস্তুত করা এবং তা সংরক্ষণ করা, ছাত্র ভর্তি, ছাত্রদের রেকর্ড রাখা, সুষ্ঠুভাবে পাঠাগার পরিচালনায় সাহায্য করা, ল্যাবরেটরি রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা প্রচুর।

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব :

শিক্ষাগত দায়িত্ব : প্রধান শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নেবার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত মান সম্পর্কে শিক্ষক অবহিত থাকেন এবং শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে বহুবিধ কাজ প্রধান শিক্ষক করে থাকেন।

প্রশাসনিক দায়িত্ব :

১) **পরিকল্পনা সংক্রান্ত দায়িত্ব :** বিশেষ করে ভর্তি সংক্রান্ত, সময় বণ্টন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, কর্ম বণ্টন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, সাজ সরঞ্জাম সংক্রান্ত পরিকল্পনা ইত্যাদি প্রধান শিক্ষক করে থাকেন।

২) **পরিকল্পনা সংক্রান্ত দায়িত্ব :** পঠন-পাঠন পরিচালনা, স্কুলের অফিস চালানো, সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলির পরিচালনা, পাঠাগার ও পরীক্ষাগার পরিকল্পনা ইত্যাদি প্রধান শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

৩) **তত্ত্বাবধানমূলক কাজ :** স্কুলের পঠনপাঠনের দায়িত্বের তত্ত্বাবধান, পাঠাগার ও পরীক্ষাগারের তত্ত্বাবধান, ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধান, শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধান ইত্যাদি প্রধান শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

৪) **পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব :** বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র তৈরি, প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণ, পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ফলপ্রকাশ ও প্রোমোশন ইত্যাদিও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

৫) **নির্দেশনামূলক দায়িত্ব :** ছাত্রদের নির্দেশনা, শিক্ষকদের নির্দেশনা, অভিভাবকদের প্রতি পরামর্শ দান ইত্যাদি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব।

৬) **বিবিধ দায়িত্ব :** অফিস সংক্রান্ত দায়িত্ব, অর্থনৈতিক দায়িত্ব, বিদ্যালয়গৃহ সংক্রান্ত কাজ, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত কাজ, শিক্ষা বিভাগ সংক্রান্ত কাজও প্রধান শিক্ষক পালন করেন।

সামাজিক দায়িত্ব :

(১) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের আমন্ত্রণ জানানো।

(২) অভিভাবক দিবস পালন করা/সভা করা।

(৩) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করানো।

(৪) নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সমাজসেবামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা ও বাস্তবায়ন করা।

(৫) বৃক্ষরোপণ উৎসব, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করা।

(৬) এছাড়াও শিক্ষক শিক্ষার এমন উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলেন। যাতে শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তা বোধ করে, ভয় না পায়, শিশু বা শিক্ষার্থীরা যাতে স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন করতে পারে। শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারে।

(৭) শিক্ষক সমতার ভিত্তিতে শ্রেণীকক্ষ নিয়ন্ত্রিত কারণ।

(৮) প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন, তারা যাতে বঞ্চিত না হয়।

(৯) এছাড়াও শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে যত্ন কারণ ও ভালোবাসেন এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদেরকে বুঝতে চেষ্টা করেন।

(১০) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচয় ব্যতিরেকে নিরপেক্ষভাবে সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার করে থাকেন।

(১১) আধুনিক শিক্ষক বন্ধু, দার্শনিক ও পথপদর্শকের (Friend-Philasepher and Guide) ভূমিকা পালন করে থাকেন।

(১২) বর্তমানে শিক্ষক সহায়ক ও সাহায্যকারী (Scafolding) হিসাবে কাজ করে থাকেন।

সহ শিক্ষকগণের ভূমিকা ও দায়িত্ব :

শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব

শিশুমূলক	নৈতিক ও চরিত্রবিকাশ	সম্পর্কস্থাপন	মূল্যায়ন	বিদ্যালয়ের উপর সামগ্রিক উন্নয়নের দায়িত্ব

শিক্ষামূলক দায়িত্ব :

(১) পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে শিক্ষক ভূমিকা পালন করে থাকেন।

(২) শিক্ষার্থীর শিখনে আগ্রহ সৃষ্টি করা শিক্ষকের কাজ।

(৩) শিক্ষার্থীর পাঠাভ্যাস ও কর্মের অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা শিক্ষক করে থাকেন।

(৪) পাঠ পরিকল্পনাও শিক্ষক করে থাকেন, এছাড়া শিক্ষার্থীদের উদার মনোভাব গড়ে তোলা, মুক্তচিন্তা করার শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি শিক্ষক করে থাকেন।

(৫) শিক্ষার্থীর আচরণ নিয়ন্ত্রণে ও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত উন্নয়নে শিক্ষক ভূমিকা পালন করে থাকেন।

(৬) এছাড়াও শিক্ষক শিক্ষার এমন উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলেন যাতে শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তা বোধ করে, ভয় না পায়, শিশু বা শিক্ষার্থীরা যাতে স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন করতে পারে। শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারে।

(৭) শিক্ষক সমতার ভিত্তিতে শ্রেণিকক্ষ নিয়ন্ত্রিত করেন।

(৮) প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন, তারা যাতে বঞ্চিত না হয়।

(৯) এছাড়াও শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে যত্ন করেন ও ভালোবাসেন এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদেরকে বুঝতে চেষ্টা করেন।

(১০) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচয় ব্যাতিরেকে নিরপেক্ষভাবে সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার করে থাকেন।

(১১) আধুনিক শিক্ষক বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শকের (Friend-Philosopher and Guide) ভূমিকা পালন করে থাকেন।

(১২) বর্তমানে শিক্ষক সহায়ক ও সাহায্যকারী (facilitator) হিসাবে কাজ করে থাকেন।

নৈতিক ও চরিত্র বিকাশের দায়িত্ব :

(১) শিক্ষকের নির্দেশনা দানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী চারিত্রিক গুণাবলির উন্মেষ ঘটায়। শিক্ষার্থীর নেতৃত্বের সংরক্ষণও শিক্ষকের কাজ।

(২) শিক্ষার্থী যাতে স্বার্থপর না হয়ে পড়ে সেদিকে শিক্ষককেই নজর রাখতে হবে এবং শিক্ষার্থীর সংবেদনশীলতাও শিক্ষক দ্বারা সৃষ্টি হয় বহু ক্ষেত্রে।

(৩) শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার উন্মেষ ঘটানো ও ক্ষমতা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে শেখানোও শিক্ষকের কাজ।

(৪) শিক্ষার্থীর নৈতিক আচরণ, আদর্শ ইত্যাদি তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

শৃঙ্খলা স্থাপনের ভূমিকা ও দায়িত্ব :

(১) শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র, উপকরণগুলির যথার্থ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে একজন শিক্ষক ভূমিকা পালন করে থাকেন।

(২) শিক্ষার্থীর শৃঙ্খলা, ব্যবহার, অসংযত আচরণের সংশোধন করানো, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করা ইত্যাদি শিক্ষকের অন্যতম কাজের মধ্যে পড়ে।

মূল্যায়ন সম্পর্কিত ভূমিকা এবং দায়িত্ব :

(১) শিক্ষক অভীক্ষাপত্র তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির পরিমাপ করেন।

(২) শ্রেণিকক্ষের কাজ, বাড়ির কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের পরিমাপ শিক্ষক করে থাকেন।

(৩) শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা রচনা করে এবং অভীক্ষার মাধ্যমে ফলাফলের অঙ্গ নির্ণয় করে শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধাগুলোর সম্পর্কে জানাও একজন শিক্ষকের কাজ।

(৪) বিদ্যালয়ের মূল্যায়ন ও নির্দেশনার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিকে বা বিশেষজ্ঞকে সাহায্য করা। এছাড়াও বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়নে দায়িত্ব পালন করা যেমন— শিক্ষাকার্যের তত্ত্বাবধান, খাতাপত্রাদি হিসাবে সংক্রান্ত তত্ত্বাবধান, হোস্টেল, গ্রন্থাগার প্রভৃতির তত্ত্বাবধান, পাঠাগারের তত্ত্বাবধান, শ্রেণিশিক্ষণের তত্ত্বাবধান, পরীক্ষাকার্যের তত্ত্বাবধান, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির তত্ত্বাবধান, বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যচর্চার তত্ত্বাবধান এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, সহ শিক্ষকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, অভিভাবকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, অন্যান্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এছাড়া বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনও শিক্ষকের কাজের মধ্যে পড়ে।

- **ক্রিয়াকলাপের অগ্রগতি যাচাই (Check your progress) :**

(1) প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব কী?

(2) সহ শিক্ষকের দায়িত্ব কী?

(3) শিক্ষা কর্মীদের ও বিদ্যালয়ের দায়িত্ব কী কী?

শিখনের ফলশ্রুতি (Learning outcome)

আলোচ্য উপএককটি অধ্যয়ন করে,

১। শিক্ষার্থী শিক্ষক প্রধান শিক্ষকমহাশয়ের ও সহ শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি সম্পর্কে জানতে পারবে।

২। শিক্ষক শিক্ষার্থী, প্রধান শিক্ষক ও সহ শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে সক্ষম হবে।

৭.৪ বিদ্যালয় এবং সহায়ক সংস্থাগুলির মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between support organisation & the school)

উদ্দেশ্য :

(১) সহায়ক সংস্থাগুলির সম্পর্কে জানা

(২) বিদ্যালয়ের সহায়ক সংস্থাগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক সম্বন্ধে জানা

(১) সহায়ক সংস্থাগুলির সম্পর্কে জানা :

সংবিধান অনুযায়ী ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা একটি যৌথ (Concurrent) ব্যবস্থা। কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার এর ভূমিকা পালন করে থাকে।

কেন্দ্রীয় সরকার - সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড অফ এডুকেশন (CABE), সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (CBSE), ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (NCERT), ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচার এডুকেশন (NCTE), কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন ইত্যাদির সহায়ক সংস্থাগুলির মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনা বা উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে।

রাজ্য সরকার - স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (SCERT), বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (BSE), স্টেট টেক্সট বুক বোর্ড (STBB), এছাড়া জেলা শিক্ষা অফিস (DEO), জেলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ বা ডিস্ট্রিক্ট ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (DIET) ইত্যাদি শিক্ষা সহায়ক সংস্থাগুলি শিক্ষার উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও পরিমার্জনে সহায়তা করে চলেছে।

(২) বিদ্যালয়ের সহায়ক সংস্থাগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক সম্বন্ধে জানা :

- Central Board of Advisory Board of Education (CABE) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা সম্পর্কিত পরামর্শ দান, শিক্ষার তথ্য সংগ্রহ, গত বছরের অর্জিত ফলাফল বিচারকরণ এবং পরবর্তী বছরগুলির শিক্ষামূলক কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- Central Board of Secondary Education (CBSE) মাধ্যমিক শিক্ষার সিলেবাস, পরীক্ষাগ্রহণ, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন দান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পাঠক্রম প্রণয়ন করে থাকে।
- National Council of Educational Research and Training (NCERT) : শিক্ষা সম্পর্কিত সার্ভে, অনুসন্ধান, গবেষণা, শিক্ষকদের প্রাকবৃত্তি এবং বৃত্তিকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি গ্রহণ, বিদ্যালয়ের উন্নত শিক্ষাকৌশল সম্পর্কিত তথ্যের বিস্তার, শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণার বিস্তার, আর্থিক সহযোগিতা, বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে।
- National Council of Teacher Education (NCTE) : এর কাজ হল শিক্ষক শিক্ষা কর্মসূচি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দান, শিক্ষকদের প্রবহমান শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান, শিক্ষক শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রাধিকার দান, নীতি প্রণয়ন, শিক্ষা পরিকল্পনা, কেন্দ্রীয়, রাজ্য, UGC এবং অন্যান্য সংস্থাগুলিকে পরামর্শ দান ইত্যাদি।
- কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন : CBSE, NCERT ও অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতায় বিদ্যালয় শিক্ষার উপর গবেষণা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য তৈরি, বিদ্যালয় শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে থাকে।

আবার রাজ্য সরকারের State Council of Educational Research & Training (SCERT) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, জেলা ও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, বিদ্যালয় পরিদর্শকদের জন্য বৃত্তিকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। রাজ্যের প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, শিক্ষক-শিক্ষার পাঠক্রম প্রণয়ন করা, বিদ্যালয়ে শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্য বই প্রস্তুত করে থাকে। এছাড়া বিদ্যালয় শিক্ষায় তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা পরিচালনা, আধুনিক প্রযুক্তি ও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষাপ্রকরণের সাহায্যে বিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো, NCERT ও NCTE-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করানোর কাজ করে থাকে।

- Board of Secondary Education (BSE) : বিদ্যালয় অনুমোদন, সিলেবাস তৈরি, টেক্সট বই তৈরি, মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষাগ্রহণ ও তার ফল প্রকাশ করা, বিদ্যালয়গুলির গুণমান বাড়ানোর কাজ, শিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নতিসাধন, বৃত্তিকালীন শিক্ষার ব্যবস্থা, পরীক্ষক ও প্রশ্নপত্র তৈরির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

- স্টেট টেক্সট বুক বোর্ড (State Text Book Board) : অভিজ্ঞ লেখকবৃন্দ, অভিজ্ঞ এডিটর, রিভিউয়ার ও মূল্যায়নকারী নিয়োগ করা, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ, তার মূল্যায়ন করে অনুমোদন, বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কিত গবেষণা, SCERT, ডাইরেক্টরেট এবং সেক্রেটারিয়েটের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা, পাঠ্যপুস্তক লেখক এবং তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকেন।

- District Education Office (DEO) : বিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধান এবং নিয়মকানুন অনুসরণ করানো, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের বদলি, বিভিন্ন নির্দেশ সরবরাহ (সরকারি), ছুটিমঞ্জুর, প্রমোশন দেওয়া ইত্যাদি কাজ করে থাকে। এছাড়াও বিদ্যালয় উন্নতির জন্য পরামর্শ দান, সহযোগিতা, রাজ্য স্তরের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন, পাঠক্রম ও সহ পাঠক্রম কর্মসূচিগুলির পরিচালনার নির্দেশ দান, বিভিন্ন অসুবিধা ও সমস্যার উপর নজর দান করে থাকে।

- District Institute of Education & Training (DIET) : স্থানীয় শিক্ষায় চাহিদা ও সমস্যা সম্পর্কিত অনুসন্ধান, বিভিন্ন শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের প্রাকবৃত্তি ও বৃত্তিকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, শিক্ষকদের বিষয় জ্ঞান ও পাঠদানের উন্নতিকরণ ও উৎকর্ষসাধন, সক্রিয় গবেষণা ও সক্রিয় গবেষণার উপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান করে থাকে। বিদ্যালয়ের শিখনের গুণগত মানের উন্নয়নের দিকেও নজর দেয়।

- **অগ্রগতি যাচাই (Check your progress) :**

  (1) কয়েকটি বিদ্যালয় সহায়ক সংস্থার নাম লেখ।

  (2) বিদ্যালয় সহায়ক সংস্থাগুলির মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে দু-চার লাইন লেখ।

শিখনের ফলশ্রুতি (Learning outcome) :

- শিক্ষা সহায়ক সংস্থাগুলিকে সংজ্ঞায়িত করতে সমর্থ হবে।
- বিভিন্ন সহায়ক সংস্থাগুলির বৈশিষ্ট্য জানতে বা বুঝতে পারবে।
- বিভিন্ন সহায়ক সংস্থাগুলির সঙ্গে বিদ্যালয়ের সংযোগসাধন করতে পারবে।

৭.৫ বিদ্যালয় সংস্কৃতি, সংগঠন, নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার ধারণা। বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলির যেমন সমবেত প্রার্থনা, বাৎসরিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিদ্যালয়ে সংস্কৃতির গঠনে ভূমিকা (What is school culture, organization, leadership and management? What is the role of school activities such as Assemblies, Annual days etc. in the creation of school culture?)

উদ্দেশ্য :

১। শিক্ষার্থী শিক্ষকের বিদ্যালয় সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা গঠন হবে।

২। শিক্ষার্থী শিক্ষক নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যাবলি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।

৩। শিক্ষার্থী শিক্ষক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করে আত্মপ্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত হবে।

বিদ্যালয় সংস্কৃতি :

বিদ্যালয় পরিবেশের অন্তর্গত মূল্যবোধ, আচার-ব্যবহার, নিয়মাবলি ইত্যাদি যা বিদ্যালয়ে আছে তারই সম্মিলিত রূপ হল নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ের সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বলতে সাধারণভাবে বোঝায় কতকগুলি আদর্শ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ঐতিহ্য এবং রীতি-নীতি যা সময়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। বিদ্যালয় সংস্কৃতির মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক আছে।

বিদ্যালয় সংস্কৃতির আদর্শগত দিক :

(১) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা বন্ধুত্বসুলভ আচরণ, বিজ্ঞানসম্মত মানসিকতা, সহমর্মিতাবোধ ইত্যাদি গুণাগুণ থাকবে।

(২) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক সাফল্যকে স্বীকৃতি দেবেন।

(৩) প্রধান শিক্ষক ও সহ শিক্ষকগণের নেতৃত্বদান সর্বদা গণতান্ত্রিক হবে।

(৪) সকলকে উপযুক্ত মর্যাদাদান।

(৫) শিক্ষকদের পেশাগত ক্ষমতার বিকাশ ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগদান।

(৬) শিক্ষার্থীদের ভুল-ভ্রান্তিগুলি ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য না হওয়া।

(৭) বিদ্যালয় পরিবেশ সর্বদা সংস্কৃতি গড়ে তোলার আদর্শ-স্থান হবে।

(৮) প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে।

বিদ্যালয় সংগঠন (School organization) :

নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে একদল ব্যক্তি প্রথাগত নিয়ম মেনে একত্রিত হয়ে কাজ করে তখন তাকে সংগঠন বলে। বিদ্যালয় হল একটি সংগঠন। বিদ্যালয় সংগঠনের কাঠামোর মধ্যে অন্তর্গত হলেন প্রধান শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থী, পরিচালন কমিটির সদস্য-সদস্যাবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ। সংগঠনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা হল।

(১) অন্যান্য সংগঠনের ন্যায় বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্য সরকারি অনুমোদন অর্জন করতে হয়।

(২) অন্যান্য প্রথাগত সংগঠনের ন্যায়, বিদ্যালয়ের School Management Committee (SMC) নিয়ম মেনে গঠিত হয়।

(৩) অন্যান্য সংগঠনের মতো বিদ্যালয়ে ক্রমপর্যায়ভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ আছে যার সর্বোচ্চপদে আছেন প্রধান শিক্ষক।

(৪) ক্রমপর্যায়ভিত্তিক যে সব ব্যক্তি আছেন তাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্ব আছে।

(৫) প্রথাগত সংগঠনের মতো বিদ্যালয়েরও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বর্তমান। তা হল ব্যক্তির চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও জ্ঞান আহরণে সহায়তা করা।

বিদ্যালয়ে নেতৃত্ব :

নেতৃত্ব হল এক প্রকারের কর্ম সম্পাদনের কৌশল যার দ্বারা একটি সংগঠিত দল সম্মিলিতভাবে কাজ করে। নেতৃত্ব হল কোনো লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ দলকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া।

Koontz ও O'Donnel-এর মতে— "Leadership is the ability of a Manager to introduce subordinates to work with confidence and zeal"

নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য :

(১) নেতৃত্ব হল অনুগামীদের প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া।

(২) নেতৃত্ব একটি সংগঠিত দলের অন্তর্গত সদস্য-সদস্যাগণকে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য পথপ্রদর্শন করে।

(৩) নেতৃত্ব অনুসরণকারীদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও যোগাযোগ রেখে চলে।

(৪) নেতৃত্ব অনুসরণকারীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় উৎসাহ, পরামর্শ ও নির্দেশদান করে।

বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। বিদ্যালয় হল একটি সংগঠন (Organization)। সুতরাং বিদ্যালয়ের কতকগুলি লক্ষ্যকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে হলে যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। বিদ্যালয় পরিচালনা, বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা, কর্মবণ্টন ও নির্দেশদানের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রয়োজন।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা (Management in School) :

পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে উপস্থিত সম্পদের উৎকর্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে কোনো সংগঠনের সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াকে শিক্ষাব্যবস্থাপনা বলে। শিক্ষাব্যবস্থাপনায় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সকলেই উৎকর্ষতার সাথে এবং কার্যকরীভাবে একত্রে কাজ করে। বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে RTE Act, 2009 অনুযায়ী একটি করে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি (SMC) আছে। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত বিষয়গুলি হল— বিদ্যালয় ভবন (School Plant) আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অফিস সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা, সময়ের ব্যবস্থাপনা, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

বিদ্যালয় কার্যাবলি :

বিদ্যালয়ের কার্যাবলি বলতে সামগ্রিক অর্থে পাঠক্রমিক, সহপাঠক্রমিক, বিদ্যালয় অ্যাসেম্বলি, বিদ্যালয় দিবস পালন ইত্যাদি বোঝায়। সাংস্কৃতিক কার্যাবলি, বিদ্যালয় দিবস, বিদ্যালয় অ্যাসেম্বলি ও অন্যান্য সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রবণতা, ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। আগামী দিনে এই সকল কার্যাবলি ব্যক্তির বৃত্তি বা পেশার সূচনা করতে পারে এবং খ্যাতি অর্জনের পাথেয় হতে পারে।

বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে সহায়তা করে। সার্বিক বিকাশ বলতে দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, নৈতিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক বিকাশকে বোঝায়। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ের দ্বারা প্রথম সামাজিকীকরণ শিক্ষা সম্পন্ন হয়। বিদ্যালয়ে সংঘটিত বিভিন্ন Workshop, Seminar কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের সহায়ক নয় এগুলি বিভিন্ন সামাজিক গুণ, যথা- নিয়মানুবর্তিতা, সহযোগিতা, সহানুভূতি জাগ্রত করে। এছাড়া বিদ্যালয়ে পালিত জাতীয় দিবস শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেমের সঞ্চার করে যা পরবর্তীকালে দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রভৃতি গুণের বিকাশ ঘটায়। এছাড়া, জাতীয় দিবস পালনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতিগত, ধর্মগত, লিঙ্গ ব্যবধান দূরীকরণ হয়। এর ফলে সংস্কৃতিসম্পন্ন, উদার, মার্জিত হিসাবে সমাজে শিক্ষার্থী আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করে। এছাড়া বিদ্যালয়ের সমাজের প্রতি যে দায়বদ্ধতা থাকে তা পূর্ণতা লাভ করে।

School activities গুলিকে বিদ্যালয়ে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা উচিত। এগুলির যথাযথ পালনের মধ্য দিয়ে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে ওঠে। Activities গুলিকে ঠিকমতো সংগঠন করে বা সাজিয়ে পালন করার মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক ক্ষমতার বৃদ্ধি হয় ও ব্যবস্থাপনার শক্তি বৃদ্ধি পায়। নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন আন্তঃসম্পর্কযুক্ত ও একটি ক্ষমতা বা গুণ অপর ক্ষমতা বা গুণের বিকাশে ধনাত্মক দিকের বিকাশ ঘটায়। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যালয় স্তরে এই গুণগুলির বিকাশের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। তাই বিদ্যালয় স্তরে আমাদের এই গুণগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে নজর দেওয়া দরকার। Encyclopedia-তে School leadership সম্পর্কে বলা হয়েছে, "School leadership is located within a political framework of possibilities and limitations structured by educational policy. Moreover school leadership has a relationship with economic markets, potentially competitive in nature, that is played out at local, national and global levels." — পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান Evaluation-এর যে Model সেই Model-এ মূল্যায়নের Formative অংশে নেতৃত্ব বিকাশের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। নেতৃত্ব সামাজিক ও ব্যক্তিগত গুণাবলির বিশেষ সমন্বয় সাধন করে থাকে।

বিদ্যালয় অ্যাসেম্বলি : যে কোনো বিদ্যালয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থী ও অন্যান্য সদস্যরা দিনের প্রথমেই একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হয়।

সাধারণত অ্যাসেম্বলি হল যেখানে প্রার্থনার শেষে নির্দেশনা দেওয়া হয় বা অনেক সময় বর্তমান সমাচার পড়ে শোনানো হয়। আবার কোনো কোনো বিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ভাষণ দেয় এবং প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষক অথবা শিক্ষিকা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। বিদ্যালয় অ্যাসেম্বলিতে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কার্যাবলি ও প্রোগ্রাম সুস্পষ্ট করে এবং সহপাঠক্রমিকা কার্যাবলির ওপর ফোকাস করে।

বিদ্যালয় অ্যাসেম্বলি : একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল একত্রিত যেখানে বিদ্যালয়ের প্রতিটি সদস্য মিলিত হয় একটি নির্দিষ্ট স্থানে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে (sense of togetherness) ও ঐক্য মনোভাব স্থাপন করা হয়।

(১) বিদ্যালয় অ্যাসেম্বলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল যে মডারেটার যেন দক্ষ Motivational speaker-কে আহ্বান করা হয় যাতে তার ভাষণ সকলেই বুঝতে পারে এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহিত করতে পারেন।

বিদ্যালয় অ্যাসেম্বলিতে inspiring ও Motivational speech-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে স্বয়ং বিকাশে সাহায্য করে এবং অনেক বিষয়ে ইতিবাচক অবদান রাখে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় (Achievement & standard)

(২) বিদ্যালয় অ্যাসেম্বলি Motivational speech-এর ভাষণ শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেয় নিজের ও সর্বজনীন মূল্যবোধ যেমন সততা, শান্তি, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করে প্রয়োগ করতে পারে।

(৩) Motivational speech পাঠক্রমের ব্যক্তিগত ও সামাজিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ (crucial) অবদান আছে।

(৪) নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকেও S.A.-এর সাহায্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা হয় বা প্রশিক্ষণ বা শিক্ষণ প্রদান করা হয় যেগুলো চিরাচরিত বা প্রাচীন শ্রেণিকক্ষের পরিবেশে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন :

A. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন —

i) শিক্ষার্থীর সামাজিকীকরণে সহায়তা করে —

(a) জাতীয় দিবস পালন (c) দুটিই

(b) বিভিন্ন Assemblies (d) কোনোটি নয়

ii) নিম্নলিখিত কোনটি শিক্ষার্থীর জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটায় —

(a) জাতীয় দিবস পালন (c) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

(b) সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি (d) সব কটি

B. সংক্ষেপে দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দিন

(i) নেতৃত্বের সংজ্ঞা দিন।

(ii) প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?

(iii) বিদ্যালয়ের মানবসম্পদ ও জড় সম্পদ বলতে কী বোঝায়?

C. সংক্ষেপে উত্তর দিন

(i) বিদ্যালয়ে বিভিন্ন Assemblies এবং জাতীয় দিবস পালনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

শিখনের ফলশ্রুতি :

আলোচ্য উপএককটি পাঠ করে,

১। শিক্ষার্থী শিক্ষক বিদ্যালয় কৃষ্টি বলতে কী বোঝায় তা উপলব্ধি করবে।

২। শিক্ষার্থী শিক্ষক নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করতে সক্ষম হবে।

৩। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করতে সচেষ্ট হবে।

৭.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

আলোচ্য এককে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি বা প্রশাসনিক পরিচালন সমিতির বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বিদ্যালয় পরিচালনের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক মহাশয় ও সহ শিক্ষক মহাশয়দের বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয় সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। সহ শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান সহ সমস্ত কার্যাবলি পরিচালনাতে সহযোগিতা করবেন। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন Support organization গুলি সমাজ বিদ্যালয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। বিদ্যালয় যে সমাজের অংশ তার উপলব্ধি যেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বার্থকভাবে হয়। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন activities গুলি শিক্ষার্থীর মধ্যে দৈহিক ও মানসিক বিভিন্ন গুণাবলির ও সক্ষমতার বিকাশ করবে। তাই সারা বৎসর যাবৎ শিখন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে activities গুলি অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত হবে।

৭.৭ অনুশীলনী (Exercise)

১. প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের শ্রেণিবিভাগ কর। এ প্রসঙ্গে প্রতিটি বিভাগের বিশদ আলোচনা কর।

২. প্রধান শিক্ষক ও সহ শিক্ষকের দায়িত্ব আলোচনা কর।

৩. বিদ্যালয়ের সহায়ক সংস্থাগুলি কী কী? এই সংস্থাগুলির সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক আলোচনা কর।

৪. বিদ্যালয় সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? বিভিন্ন বিদ্যালয় কার্যাবলি কীভাবে বিদ্যালয় সংস্কৃতি গঠনে সাহায্য করে।

৭.৮ তথ্য উৎস (Reference)

1. *NCERT (2006*). National Curriculum Framework, 2005, New Delhi : NCERT
2. School Organization – S. K. Kochar – Sterling Publishers.
3. School Organization – S. K. Sharma – Neelkamal.
4. School Administration & Management – S. K. Kochar – Sterling Publishers.

অধ্যায় ৮

বিদ্যালয়ে কার্যকারিতা ও বিদ্যালয় মান
(School Effectiveness and School Standards)

৮.১ সূচনা (Introduction)

বিদ্যালয় সম্পর্কে ধারণা বা জনমত তখনই আমাদের তৈরি হয় যখন সেই বিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা তাদের নিজের বিদ্যালয়কে নিয়ে খুশি বা অখুশি হয়। একটি বিদ্যালয় ভালো বা খারাপ আমরা জানতে পারি তার পরিবেশ, পঠন-পাঠন, শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষার্থীদের আচরণ, তাদের পরীক্ষার ফলাফল এবং সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কতখানি সমাজে প্রতিষ্ঠিত বা সফল হতে পেরেছে। এইসব নির্ধারণ করে শিক্ষার মান কেমন সেই বিদ্যালয়ে।

- যেকোনো শিক্ষা ব্যবস্থার কয়েকটি উদ্দেশ্য থাকে। সেই উদ্দেশ্যগুলি আসলে সঠিকভাবে নির্ধারিত হচ্ছে কি না, এবং শিক্ষার্থীরা কী পরিমাণে এই উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করছে সেটা জানা খুব দরকার।
- সময়ের বা যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক্রমের ঠিকমতো সংশোধন হচ্ছে কি না,
- কোনো একটি শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে কি না এবং
- সেটি রূপায়ণের জন্য পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ হচ্ছে কি না, বিদ্যালয়ে নিয়মিত পরিদর্শন ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা আছে কি না, এবং
- সব থেকে যেটা জরুরি সেটা হল শিক্ষার্থীদের **শিক্ষার মান** সম্বন্ধে অবহিত করে তাদের উৎসাহিত করা হয় কি না। এইসব ব্যাপার জানার জন্য আমাদের বিদ্যালয়ের মান সম্বন্ধে ধারণা থাকা বা জানার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন।

৮.২ বিদ্যালয় কার্যকারিতার পরিমাপ (Measurement of School Effectiveness)

উদ্দেশ্য :
- বিদ্যালয়ের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বুঝতে পারা
- বিদ্যালয় কার্যকারিতার পরিমাপ সম্বন্ধে ভাবনা তৈরি করা।

বিষয়বস্তু :

বিদ্যালয় কার্যকারিতা বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়তে ভর্তি হবার সময় তার মনে বিদ্যালয় সম্বন্ধে যা ছবি ছিল বা নিয়ে এসেছিল তা বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর শিক্ষার্থীর যেন মনে হয় যে তার এই বিদ্যালয়ে এসে যা যা অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করেছে, তা তার প্রত্যাশাকে অতিক্রম করেছে। অর্থাৎ সে মনে যে ছবি নিয়ে এসেছিল, তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছে কি না যার ফলাফল হিসাবে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক আচরণে যে পরিবর্তনগুলি আসে সেগুলি তার নিজেরও প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে যায়। আরেক কথায় সে নিজেকে নতুন করে তার সুপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে চিনতে পারে যেটার সম্বন্ধে সে নিজে অবহিত কোনোদিনও ছিল না। আমরা যখন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার পরিমাপ করি, তখন আমরা যেন নিশ্চিত হতে পারি যে তার প্রত্যাশা অতিক্রম করছে।

উদাহরণস্বরূপ যখন কোনো মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ভর্তি হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তার শিক্ষণ পারদর্শিতার সম্পর্কে নির্দিষ্ট মানের প্রত্যাশাকে যখন সে অতিক্রম করে তখন সেইক্ষেত্রে বিদ্যালয়কে কার্যকরী বলে গণ্য করা হয়। তারপর এই একই পরিস্থিতিতে সেই বিদ্যালয়টিকে অন্য আরেক বিদ্যালয়ের সঙ্গে পারদর্শিতা বিচার করা হয়।

যে-কোনো বিদ্যালয়ে যখন শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার বেশি হয় তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তারা বিদ্যালয়ে আসতে ইচ্ছুক এবং বিদ্যালয়ে নতুন কোনো অভিজ্ঞতা বা পুরোনো অভিজ্ঞতা অর্জন করাতে পিছুপা হয় না। এর থেকে তাদের

বিদ্যালয়ের প্রতি ভালোবাসা, মনোভাব, পরিবেশ। সবই ইতিবাচক বলে মনে হয়। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বিদ্যালয়ের আবহাওয়া সম্বন্ধে ইতিবাচকভাবে আলোকপাত করে, সেটার ফলাফল রূপে বিদ্যালয়ের সংস্কৃতি তৈরি করে।

বিগত ত্রিশ বছরের গবেষণার পর বিদ্যালয় — কার্যকারিতার পরিমাপের কয়েকটি নির্ধারক গবেষকরা চিহ্নিত করেছেন। প্রচুর বিশ্লেষণের পর যে নির্ধারকগুলি বিদ্যালয় কার্যকারিতা মাপতে আমাদের সাহায্য করে সেগুলি হল :—

- শক্তিশালী নেতৃত্ব। (বিষয় অনুযায়ী শিক্ষকরা নেতৃত্ব দেবেন।)
- উচ্চ প্রত্যাশাকারী পারদর্শিতাকেন্দ্রিক শিক্ষককুল। (উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন)
- বিদ্যালয় টিমের মধ্যে উত্তম সহমত পোষণে একাত্মবোধ। (শিক্ষক-অশিক্ষক প্রত্যেকের মধ্যে মিলমিশ)
- উন্নতমানের পাঠক্রম।
- শিখনে প্রচুর সুযোগ।
- অনুকূল এবং নিরাপত্তামূলক বিদ্যালয় আবহাওয়া।
- বিদ্যালয়ে মূল্যায়নের যথেষ্ট সুযোগ।
- অভিভাবকদের উচ্চমাত্রায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ। (শিক্ষার অগ্রগতি, পরিচালনার অগ্রগতি)
- শ্রেণিকক্ষে অনুকূল আবহাওয়া।
- উত্তম শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে শিখনের সুযোগ।
- সংগঠিত এবং পরিকল্পিত পাঠদান এবং
- শক্তিশালী ফিডব্যাকের ব্যবস্থা।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :-

(১) বিদ্যালয়ের কার্যকারিতা নির্ভর করে —

(ক) বিদ্যালয়ের বস্তুগত সুযোগসুবিধার উপর।

(খ) শিক্ষকদের প্রত্যাশার উপর।

(গ) বিদ্যালয়ের মানবসম্পদের উপর।

(ঘ) বিদ্যালয়ের সংস্কৃতির উপর।

(২) বিদ্যালয়ের কার্যকারিতা পরিমাপের নির্ধারকগুলি হল —

(ক) কার্যকরী নেতৃত্ব

(খ) বিদ্যালয়ের সংস্কৃতির উন্নতিসাধন

(গ) উচ্চমাত্রার প্রত্যাশা

(ঘ) উপরের সবগুলি।

(৩) পেছনে দেওয়া প্রশ্নাবলিটি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করে আপনি আপনার বিদ্যালয়ের গুণগতমানের সম্বন্ধে একটি ধারণা প্রস্তুত করুন।

শিখনের ফলাফল :

- বিদ্যালয় কার্যকারিতা সংজ্ঞায়িত করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে কার্যকারিতা পরিমাপ করতে পারা।

৮.৩ শিক্ষার মানের অর্থ অনুধাবন ও তার বিকাশ (Understanding and developing standards in Education):

উদ্দেশ্য : ● শিক্ষার মানের ভাবনা তৈরি করা।

● শিক্ষার মানের ধারণাটা স্পষ্টকরণ করা।

বিষয়বস্তু :

শিক্ষার মান সম্বন্ধে ধারণা গঠন করতে হলে মাননীয় অমর্ত্য সেনের প্রতিষ্ঠিত প্রতীচী ট্রাস্টের একটি সমীক্ষার কথা উল্লেখ করা দরকার। সমীক্ষাটি করা হয়েছিল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষার মান নিয়ে। সমীক্ষার ফলস্বরূপ দেখা যায় যে সর্বশিক্ষা অভিযান (২০০১) এবং শিক্ষার অধিকার আইনকে (২০০৯) বাস্তবায়িত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, যার ফলে দেশের প্রায় ৯০% প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। তার মানে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠরত শিশুদের পঠন, লিখন, ভাষা শিক্ষা এবং গণিতের পারদর্শিতা তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার মতোন। যার মানে হল শ্রেণির নির্দিষ্ট মানের তুলনায় তা নিম্নমানের। এর থেকে বোঝা যায় ব্যাপক আকারে শিক্ষার প্রসার হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার মানের ওপর এইসব সরকারি প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের কোনো প্রতিফলন ঘটেনি।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা শিক্ষার মানের একটি ধারণা গঠন করতে পারি। তাহলে শিক্ষার মান বলতে বোঝায় শিক্ষাজীবনে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্তরে কী পরিমাণে জ্ঞান শিক্ষার্থীদের থাকা উচিত। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা কী পরিমাণে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে তার রূপরেখা স্থির হয় শিক্ষার মানে দ্বারা।

শিক্ষার এই মান বজায় রাখা যে-কোনো স্তরে (অর্থাৎ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা), বিশেষভাবে প্রয়োজন। যে কোনো দেশে শিক্ষার অগ্রগতি নির্ভর করে শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষার গুণগতমানের উপর। শিক্ষার মান আবার অনেক রকমের হয়। যেমন **জাতীয় স্তরের মান, রাজ্যস্তরের মান** এবং **আঞ্চলিক স্তরের মান**। শিক্ষার মান আবার নির্ণয় করা হয় সেই স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রমিক এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির উপর।

শিক্ষার মানের বিকাশ :

আমাদের দেশের স্বাধীনতার পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা পরিকল্পনা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সেই সময়ের শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা গেছিল যে প্রায় ৭০% ভারতীয় নিরক্ষর ছিল। স্বাভাবিকভাবেই নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সংবিধানে উল্লিখিত স্বাধীনতা অর্জনের ১৬ বছরের মধ্যে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা করার কথা উল্লেখ করা হয়। এই কারণেই আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে) সর্বপ্রথম বিদ্যালয় মানোন্নয়নে বেশ কিছু সুপারিশ করে যেমন অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড, পেস PACE — গতি (দ্রুত বা মন্থর) সেটিং বিদ্যালয় ইত্যাদি। সর্বশিক্ষা অভিযান (২০০১) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

এই লক্ষ্যপূরণের ক্ষেত্রে কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

(ক) সময় মতো শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা।

(খ) সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিদ্যালয়ে বজায় রাখা।

(গ) নতুন উদ্ভাবনীমূলক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

(ঘ) শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য এবং সে ব্যাপারে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

(ঙ) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতির ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া।

(চ) বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের সঙ্গে একটি নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং তাদেরকে তাদের শিশুদের মূল্যায়নের ফল সম্বন্ধে অবহিত করা।

(ছ) পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষার অগ্রগতির দিকে ভালো করে নজর দেওয়া।

(জ) বিদ্যালয়ের চারিপাশের এলাকায় প্রস্তাবিত গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্রকে ব্যবহার করা এবং শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের সমন্বিত পরিকল্পনাগ্রহণ।

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষার অধিকার আইন (২০০৯) কয়েকটি বিধি উল্লেখ করেছে যেমন —

(ক) পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা —

প্রথম শ্রেণি থেকে - পঞ্চম শ্রেণি

শিক্ষার্থী	শিক্ষক
৬০	২ (শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ১:৪০)
৬১-৯০	৩
৯১-১২০	৪
১২৭-২০০	৫
২০০ >	৫ + ১ প্রধান শিক্ষক

ষষ্ঠ শ্রেণি — অষ্টম শ্রেণি

বিষয় : বিজ্ঞান, গণিত, সমাজবিদ্যা, ভাষা প্রতিটি শ্রেণির জন্য থাকবে একটি করে ঘর ও শিক্ষক।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচালয়, বিশুদ্ধ পানীয় জল।

মিড-ডে মিলের জন্য রান্নাঘর

খেলার মাঠ এবং বিদ্যালয়ের সীমানা-দেয়াল।

(খ) শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা এবং তাদের কর্তব্য —

শ্রেণি	কাজের দিন	পাঠদান (ঘণ্টায়)
১ - ৫	২০০	৮০০ ঘণ্টা
৬ - ৮	২২০	১১০০ ঘণ্টা

(গ) শিক্ষার কাজের বাইরে অন্য কোনো কাজে শিক্ষকদের যুক্ত রাখা যাবে না।

(ঘ) শিক্ষাব্যবস্থা শিশুকেন্দ্রিক হতে হবে এবং সংবিধানসম্মত পাঠক্রম এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা হতে হবে।

(ঙ) বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন শিশু এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা করা।

(চ) শিক্ষকদের বৃত্তিকালীন শিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(ছ) শিশুর জ্ঞান, বোধ এবং তার প্রয়োগ ক্ষমতা পরিমাপ করার জন্য সামগ্রিক মূল্যায়ন।

(ঝ) বিদ্যালয়ে লাইব্রেরির ব্যবস্থা রাখতে হবে, সেখানে পাঠ্যবিষয়ভিত্তিক এবং গল্পের বই রাখতে হবে। তার সঙ্গে সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন।

নিজ অগ্রগতি যাচাই ঃ

(১) শিক্ষার মান বিচার হয় —

(ক) বিষয়ভিত্তিক (খ) শ্রেণিভিত্তিক

(গ) অঞ্চলভিত্তিক (ঘ) উপরের কোনোটিই নয়।

(২) শিক্ষার অগ্রগতি নির্ভর করে —

(ক) শিক্ষার প্রসারের উপর

(খ) শিক্ষার মানের উপর

(গ) শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষার মান উভয়ের উপর

(ঘ) কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রসার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষার মানের উপর।

(৩) পিছনে দেওয়া প্রশ্নাবলিটি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করে আপনি আপনার বিদ্যালয়ের গুণগত মানের সম্বন্ধে একটি ধারণা প্রস্তুত করুন।

শিখন ফলাফল ঃ

- শিক্ষার্থীরা নতুন শিক্ষার মান বুঝতে পারবে।
- শিক্ষার মান সম্বন্ধে জানতে পারবে।

৮.৪ শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা (Classroom Management and Teacher) :

উদ্দেশ্য ঃ

- শিক্ষার্থীরা যেন বিভিন্নরকম শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিচিতি হয়।
- শিক্ষার্থীরা যাতে কার্যকরী ব্যবস্থাপনার শর্তাবলির সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা তৈরি করতে পারে।
- শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় যাতে শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারে।

বিষয়বস্তু ঃ

সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে যখন একটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে চালনা করা যায় এবং বিভিন্ন শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিষয় সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে থাকে, তাকেই বলা হয় শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনা।

ডিউক (Duke-1979)-এর কথায় শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ছত্রছায়ায় আসে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা ও তাদেরকে শ্রেণিকক্ষের কার্যাবলির সঙ্গে একাত্মতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে।

শ্রেণি ব্যবস্থাপনার প্রকারভেদ ঃ

শিক্ষকের নেতৃত্বে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়।

(i) স্বৈরতান্ত্রিক শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা (Authoritarian classroom Management) :

একই ধরনের ১) শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক একটি শ্রেণিকক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং একাই সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। ২) শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কথামত না চললে শাস্তি পেতে হয়। ৩) শিক্ষণ প্রক্রিয়া এই ধরনের ব্যবস্থাপনায় পুরোপুরি শিক্ষক নির্ভর। ৪) শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং স্বাধীন চিন্তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় না। ৫) শিক্ষক এখানে সক্রিয় এবং শিক্ষার্থী এখানে নিষ্ক্রিয় থাকে। ৬) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপর শৃঙ্খলা চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং কঠোরভাবে নজরদারি করা হয়। যার ফলে ৭) শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ও শিখনীয় বিষয় প্রতি অনীহা প্রকাশ পায়। এই হেন ব্যবস্থাপনায় ৮) দলগত কাজ করা সম্ভব হয় না ও কক্ষে ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

(ii) গণতান্ত্রিক শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা (Democratic classroom Management) :

১) গণতান্ত্রিক শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে শিক্ষার্থীদের মতামত বিবেচনা করা হয়। অতএব ২) শিক্ষার্থীরা এখানে সক্রিয়। তারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, আত্মপ্রকাশ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ৩) শিক্ষক তাদেরকে স্বাধীন চিন্তা ভাবনা গঠন করাতে সহায়তা করে। তাই শিক্ষণের একটি বড় অংশে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা থাকে। ৪) শিক্ষার্থীরা এই ধরনের ব্যবস্থাপনায় শ্রেণিশৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপলব্ধি করে। ৫) শ্রেণিকক্ষের নিয়মাবলির মধ্যে নমনীয়তা দেখা যায়। ৬) এখানে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

(iii) উদাসীন শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা (Indifferent classroom Management) :

১) এই ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উভয়েরই নিষ্ঠার অভাব আসে। ২) শিক্ষক গতানুগতিকভাবে পড়ান ও দায়সারাভাবে কাজ করেন। শিক্ষার্থীরা পড়া বুঝতে পারল কি না, কোথাও অসুবিধা হল কি না, সে ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখান না। ৩) শ্রেণির কোন কাজে, শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর দুজনেরই আগ্রহের অভাব দেখা যায়। এমনকি ৪) শ্রেণিকক্ষের নিয়মাবলির উপর শিক্ষক বা ছাত্র কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না। ৫) ফলে দুজনের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়।

(iv) নৈরাজ্যমূলক শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা (Laissez faire classroom) :

১) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার বিপরীত হল নৈরাজ্যমূলক ব্যবস্থাপনা। ২) এখানে চূড়ান্ত অব্যবস্থা বর্তমান, ও শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের নিয়মাবলি মানে না। ৩) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বরং উল্টোটাই হয় এখানে। ৪) শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার ছাত্রদের ভূমিকাই বেশি দেখা যায়। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আরও বৃদ্ধি পায়। ৫) শিক্ষক অনেক সময় শিক্ষার্থীর স্বার্থরক্ষা করেন যার ফলে উভয়ের মধ্যে একটি মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠলেও, পারস্পরিক শ্রদ্ধার মানসিকতা তৈরি হয় না। ৬) তাই শিক্ষণের উদ্দেশ্য এই ধরনের ব্যবস্থাপনায় নিম্নমাত্রায় সফল হয়।

উত্তম ব্যবস্থাপনার নির্ধারক :

উত্তম ব্যবস্থাপনার সব থেকে জরুরি নির্ধারক হল শ্রেণিকক্ষের কাজে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও সহযোগিতা। আরো অন্যান্য নির্ধারকগুলি হল শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা ও অনুভূতি হল গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবস্থাপনার মান শ্রেণিকক্ষের দৈনন্দিনকাজে কিছু প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই পাওয়া যায়।

(ক) শ্রেণিকক্ষে কি শিক্ষার্থীরা উৎপাদনমূলক কাজে নিযুক্ত আছে?

(খ) কোনো দ্বন্দ্ব এবং ব্যতিক্রমী আচরণ কি অনুপস্থিত?

(গ) পাঠক্রমিক লক্ষ্য অর্জনে যে সময় নির্দিষ্ট আছে তা কী যথাযথভাবে রক্ষিত হচ্ছে?

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পারদর্শিতার সঙ্গে উত্তম ব্যবস্থাপনার ইতিবাচক সম্পর্ক দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের অনুভূতিমূলক আচরণ (মনোভাব, আত্মবিশ্বাস) এর উপর সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে শাস্তি ও বিরূপ সমালোচনা শিক্ষার্থীদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ দুর্বল ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা ও অনুভূতির উপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করে।

শ্রেণিকক্ষে ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকের ভূমিকা :

যেকোনো শ্রেণিকক্ষে ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকের উচ্চমাত্রায় কর্মে মনোনিবেশ ও নিম্নমাত্রায় বিশৃঙ্খলার সঙ্গে কিছু কিছু আচরণ সম্পর্কিত। আচরণগুলি তিনটি পর্যায় ভাগ করা হল —

(১) শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় প্রাককার্যকালীন পর্যায়ের কাজ

(২) পাঠ চালু করা ও সচল রাখা

(৩) শ্রেণিকক্ষে ব্যবস্থাপনা বজায় রাখা।

(১) প্রাককার্যকালীন কাজ ঃ এর মধ্যে আসে কী ধরনের আচরণ শিক্ষার্থীদের পাঠদানে প্রয়োজন এবং কোন আচরণগুলি অপ্রয়োজনীয় তা নির্দিষ্ট করা।

বিদ্যালয়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কী কী করণীয় তার সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা। ১) যখন শিক্ষক বা অন্য কোনো ছাত্র কথা বলবে তখন সেটি মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং সেই সময় কিছু বলার বা প্রশ্ন করার থাকলে হাত তুলে শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে হবে। ২) যাঁরা দলগতভাবে কাজ করবে তাদেরকে তদারকি করতে হবে এবং তার প্রতিক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ৩) যারা এককভাবে কাজ করবেন, তাঁরা কীভাবে কাজ সম্পাদন করবে তা জানাতে হবে। ৪) ছাত্ররা যখন শ্রেণিকক্ষের বাইরে থাকবে তখন তাদের দায়িত্ব তাদের শিক্ষকের উপর আসবে। ৫) গৃহে ফেরার আগে শিক্ষার্থীদের তাদের

বসার স্থান, ব্ল্যাকবোর্ড, শিক্ষকের টেবিল চেয়ার ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হবে। ৬) শিক্ষক পরের দিন আগের দিনের পড়া নিয়ে আকর্ষণীয় আলোচনা করবেন। ৭) শ্রেণির কাজের মধ্যের সময়, শিক্ষার্থীরা কী করবে তা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে, নচেৎ বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। ৮) শ্রেণি উপকরণ ব্যবহার এবং ভাগাভাগি করার সময় ঠিক মতো নির্দেশ দিতে হবে শিক্ষককে। ৯) কীভাবে 'টয়লেট' ব্যবহার করতে হবে, হারানো জিনিস অনুসন্ধান ইত্যাদি এগুলি সবই শিক্ষক শেখাবেন। ১০) শিক্ষকের আরেকটি কাজ হল যে সবাই যাতে স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারে শ্রেণিতে, তার ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়-উভয়কে সহজে দেখতে পায়।

২) পাঠ চালু করা ও সচল রাখা :

বিদ্যালয়ের শুরুতেই কর্মগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সময় শিক্ষার্থীদের আচরণ ও প্রত্যাশা গড়ে ওঠে। প্রথম সপ্তাহে শ্রেণির কাজে বিশৃঙ্খলা খানিকটা থাকে। এই সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কী ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করেন বা করেন না তা বলে দেওয়া হয়। এইসব আচরণ বিন্যাসে কী ধরনের বাধা আসতে পারে তা অনুসরণ করে শিক্ষক তার ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা করেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য কার্যাবলি উল্লেখ করা হয়।

প্রথম : প্রথম দিকের কাজ সহজে হবে, এবং জটিল কাজগুলি পরে আসবে।

দ্বিতীয়ত : প্রথমদিকে কাজগুলি আকর্ষণীয় হবে যাতে সব শিক্ষার্থী সাফল্য অর্জন করতে পারে।

তৃতীয়ত : শিক্ষক যতটা সম্ভব সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রাখবেন।

৩) শ্রেণিকক্ষে ব্যবস্থাপনা বজায় রাখা :

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে শিক্ষার্থীর উপর। তারা ঠিক মতো কাজ করছে কি না, কোথায় দরকার ইত্যাদি। শ্রেণিকক্ষে অবাঞ্ছিত আচরণ যদি ঘটে তাহলে তখন শিক্ষককে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে বিশৃঙ্খলা যেন ছড়িয়ে না পড়ে। সঠিক ও প্রত্যাশিত আচরণ সম্পন্ন করার জন্য সর্বদা পুরস্কারের সাহায্য নেওয়া হয়।

অ্যাসাইনমেন্টের উপকরণ এবং সময়সীমা পরিষ্কারভাবে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে। অ্যাসাইনমেন্ট শুরু হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের সমস্যা বোঝার জন্য শিক্ষকদের তদারকি করতে হবে। কাজের উন্নতি ঘটছে কি না তা জানার জন্য ফিডব্যাক নেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে, এবং তা নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :—

(১) শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকের ভূমিকাগুলি হল —

(ক) শিক্ষার্থীদের নিকট প্রত্যাশিত আচরণ নির্দিষ্ট করা।

(খ) পাঠ চালু করা ও সচল রাখা।

(গ) শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা বজায় রাখা।

(ঘ) উপরের সবগুলি।

(২) নীচের কোনটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য নয়?

(ক) দলগত কাজে অসুবিধার কারণ হয়।

(খ) শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়।

(গ) শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের মর্যাদা রক্ষিত হয়।

(ঘ) শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে।

(৩) শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনাকে বিভক্ত করা হয় —

(ক) তিনভাগে (খ) চারভাগে

(গ) দু-ভাগে (ঘ) পাঁচভাগে।

শিখনের ফলাফল

(১) শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে বুঝতে পারে।

(২) শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় বুনিয়াদি/মূল নিয়ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা একটি ধারণা গঠন করে।

(৩) শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।

৮.৫ পাঠ-পরিকল্পনা, পাঠ সঞ্চালনের প্রস্তুতি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Lesson Plans, Preparation for Transaction and Inclusive Education)

উদ্দেশ্য :

- পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করার ধারণা গঠন করা।
- পাঠ পরিকল্পনা সঞ্চালনের প্রস্তুতি নেওয়া।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা গঠন করা।

বিষয়বস্তু :—

কোনো কাজকে ভালোভাবে করতে গেলে একটি পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজই ভালোভাবে হয় না। শ্রেণির পাঠ একটি উদ্দেশ্যমুখী কাজ। তাই এটিকে উপস্থাপন করতে গেলে শিক্ষককে একটি নির্দিষ্ট বিষয় একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাখতে হবে, যার জন্য পাঠ-পরিকল্পনা প্রয়োজন দেখা দেয়।

পরিকল্পনা করা থাকলে পাঠদানের কাজ ঠিক সময়মতো অগ্রসর হতে পারে। যেহেতু পরিকল্পনা মনোবিজ্ঞানসম্মত এই পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ করতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয় উৎকর্ষতা বাড়ে এবং অনেক সহজে বিষয়টি শিক্ষার্থীরা আত্মস্থ করতে পারে।

পরিকল্পনা তৈরি করার সময় পূর্বে অর্জিত শিখন-সামর্থ্য, বিষয়, পদ্ধতি, শ্রেণি-সহায়ক উপকরণ, ব্ল্যাকবোর্ড প্রভৃতি সব কিছুর উপর গুরুত্ব দিতে হবে। ফলে শিক্ষক খুব সহজেই বিষয়টিকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। শিক্ষার্থীরাও অনেক বেশি সক্রিয় হয়। পাঠ-পরিকল্পনাতে মূল্যায়ন ও গৃহকাজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ গৃহকাজের মাধ্যমে পাঠটিকে আরও বেশি সহজ, সরল করে দেওয়া সম্ভব হয় ও শিক্ষার্থী পাঠটিকে বাড়িতে চর্চা করার সুযোগ পায়।

শিক্ষক সারাবছর যতটা পড়াবেন তা কয়েকটি এককে ভাগ করবেন। দিনে কতটুকু তিনি পড়াবেন তা শিক্ষক পরে ঠিক করে নেবেন। সেই অনুসারে শিক্ষক পরিকল্পনা রচনা করবেন ও সেই অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করবেন।

মনোবিজ্ঞানসম্মত পাঠ-পরিকল্পনা রচনা পথপ্রদর্শক হলেন হার্বার্ট। হার্বার্টের মতে জন্মের সময় শিশুর মন থাকে পরিষ্কার স্লেটের মতো। পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করে যার মধ্যে তার শিখন ও মানসিক বিকাশ ঘটে।

প্রথমে সে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে পরিবেশের উপকরণগুলিকে প্রত্যক্ষণ (PERCEPTION) করে।

দ্বিতীয়, পূর্বে অর্জিত শিখন এবং অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে বিষয়গুলিকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করে থাকে তাকে আত্তীকরণ (Assimilation) বলা হয়। যখন আমরা পুরানো ধারণার সাহায্যে নতুন কোনো ধারণা আত্তীকরণ করি, তখন তাকে সমবেক্ষণবাদ বলা হয়। (Apperception) হার্বার্ট আরও বলেন যে আমাদের যখন কোনো ধারণা গঠন হয় তখন দুটি ব্যাপার ঘটে। প্রথমে কোনো বস্তু মনের সামনে আসে যাতে মন নিবিষ্ট হয় এবং তাকেই মনোনিবেশ (Concentration) বলে। তারপর নতুন বস্তুটির সঙ্গে পুরোনো ধারণা সংযোগ হয়ে নতুন অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। একইরকমের নতুন এবং পূর্বে অর্জিত ধারণাগুলিকে এক শ্রেণিতে রাখে। পরে প্রয়োজনমতো সু-নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির মাধ্যমে এটি বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়।

হার্বার্টের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী শিক্ষা প্রক্রিয়ার স্তরগুলি হল — সুস্পষ্টতা (Clearness), সংযোগ (Association), শ্রেণিভুক্ত (classification) এবং প্রয়োগ পদ্ধতি (Application Method) ওনার অনুগামী এটিকে আর দুটি স্তরে ভাগ করেছেন — আয়োজন (Preparation) এবং উপস্থাপন (Presentation)।

পাঠ সঞ্চালনের প্রস্তুতি

পাঠ সঞ্চালনের বিশেষ করে তাত্ত্বিক বিষয়গুলি শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মাধ্যমেই সম্পন্ন করা হয়।

পূর্বে অর্জিত জ্ঞান : এই থেকে শিক্ষার্থী কী কী মনে রাখতে পারবে, সংজ্ঞা দিতে পারবে, কী কী সূত্র বা তত্ত্ব লিখতে পারবে। তারপর শিক্ষার্থী যেন উপএককটির পাঠ নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তুলনা করতে পারবে। সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করতে পারবে, ব্যাখ্যা করতে পারবে ও শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবে ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীরা যেন তারা এই পাঠের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও বোধকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তবে যে প্রয়োগ করতে পারে, সমস্যার সমাধান করতে পারে। এর পরে তারা বিভিন্ন চিত্র আঁকতে পারবে ও পরীক্ষামূলক দক্ষতা গড়ে উঠতে সাহায্য করবে।

শিক্ষণ কৌশল : উপএককটির বিষয়টি সংক্ষেপে লিখতে হবে। প্রতিপাদন বা বক্তৃতা পদ্ধতি, কোনটি কাজে লাগানো হবে তা লিখতে হবে। এই বিষয়টি পড়ানোর জন্য শিক্ষার উপকরণ কী কী লাগবে তা লিখতে হবে এবং অবশ্যই ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করতে হবে। সবশেষে যে অংশটি পড়ানো হল তার সারসংক্ষেপ থাকবে যাতে কম করে ১০টি প্রশ্ন দিতে হবে। জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও দক্ষতার কথা মাথায় রেখে।

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পদ্ধতি যেমন আলোচনা পদ্ধতিতেও পাঠক্রমিক বিষয় সঞ্চালন করা যেতে পারে। সার্ভে, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, অডিও ভিডিও কৌশল, সেমিনার, টিউটোরিয়াল ইত্যাদিরও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা :

সালামানকায় অনুষ্ঠিত 'বিশেষ চাহিদাযুক্তদের শিক্ষা-সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে' (1994) প্রথম বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষালাভের বিষয়টিকে নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা এই বিশেষ লক্ষপূরণের উদ্দেশ্যে চালু হয়েছে, যাতে প্রতিটি শিশু তাদের চাহিদা সামাজিক পরিস্থিতি নির্বিশেষে সমাজে অন্যান্য সব শিশুই কোনো-না-কোনোভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন। তাই অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের সহানুভূতির পরিবর্তে এমন ব্যবস্থায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাকে তারা অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে পারে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সংজ্ঞা :

Booth (1996) ঃ অন্তর্ভুক্তি হল একটি প্রক্রিয়া যা শিক্ষায় অংশগ্রহণের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাকে কমিয়ে আনে।

Anita el al (2002) ঃ যখন কোনো সক্ষম শিক্ষার্থীকে নিঃশর্তভাবে প্রথাগত বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ও গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে তখনই তা হবে অন্তর্ভুক্তিকরণ।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য :

(ক) সাধারণ শিশুদের মতো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ও একইরকম সুযোগসুবিধা দেওয়া।

(খ) সমাজকে এই বিষয়ে সচেতন করা, যে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা ব্যতিক্রমী হলেও তারা শিশুই।

(গ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করা।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা :

শিক্ষা পৃথকীকরণ থেকে সমন্বিত হয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় পরিণত হয়েছে। এই ধরনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হল :—

(i) শিক্ষা প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকার, তাই এদেরকে গ্রহণযোগ্য স্তরে শিক্ষা অর্জনের জন্য দরকার। শিশুদের মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

তাহলে 'অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা' হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সব সম্প্রদায়ের সব শিশু, মানসিক বা শারীরিক বা অন্য কারণে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরাও এক্ষেত্রে ওই অঞ্চলের বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণাকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করতে পারি —

(ক) যে কোনো শিশুর শারীরিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, ভাষাগত বা অন্য কোনো পরিস্থিতিতে থাকুন না কেন, তাকে বিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার দেওয়াই হল অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা।

(খ) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এমন একটি উপায় যা বিভিন্ন বাধাগুলিকে অপসারণ করতে উদ্যোগী হয়। এই বাধা নানা ধরনের হতে পারে যেমন জাতিগত, লিঙ্গগত, সামাজিক স্তর সংক্রান্ত, দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি।

(গ) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থায় স্থানীয় প্রয়োজন, চাহিদা, পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার কথা বলা হয়েছে। যাতে প্রতিটি শিশুকে শিক্ষার বিভিন্ন সুরে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

(ঘ) এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানে শিশুদের সঙ্গে ব্যতিক্রমী শিশুরা এক সঙ্গে বিনা বাধায় পড়ার সুযোগ পায়। তখনই কিন্তু অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা সার্থকতা লাভ করে।

(i) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার লক্ষ্য হল, যাতে শিক্ষাব্যবস্থা আনন্দময়, উৎপাদনশীল ও ব্যবহারমুখী নাগরিক তৈরি করা।

(ii) প্রত্যেকটি শিশুর আলাদা বৈশিষ্ট্য, আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিখনের জন্য এই শিক্ষা প্রয়োজন।

(iii) যাদের বিশেষ শিক্ষাগত চাহিদা আছে তাদের প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্র অর্জনের জন্য এই শিক্ষা প্রয়োজন।

(iv) শিশুদের মধ্যে যাতে আমরা ব্যক্তিত্বের গুণাবলি তৈরি করতে পারি।

(v) শিশুদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করার জন্য এবং জীবন প্রস্তুতির শিক্ষার জন্য এই শিক্ষার প্রয়োজন।

(vi) মানবসম্পদ ও শিক্ষাসম্পদের প্রকৃত ও কার্যকরী ব্যবহারের জন্য এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন।

(vii) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ব্যাপকভাবে বিস্তৃত বিকল্পের সন্ধান দেয়।

(viii) এই শিক্ষা পক্ষপাতিত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে লড়াই করার, নতুন অভিবাদনমূলক সমাজ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের সাহায্য করে।

(ix) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাম্য আনতে এবং সকলকে সমান সুযোগ দিতে সাহায্য করে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সুবিধা :

- শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিশেষ শক্তি ও সামর্থ্যকে প্রশংসা করতে শেখে।
- শিক্ষার্থীরা পরস্পরকে সাহায্য করতে উৎসাহিত হয়।
- অক্ষমতাযুক্ত শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক উপায়ে স্বাভাবিক পরিবেশে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

(১) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্যে পরিসেবাগুলি হল —

(ক) বিশেষ শিশুদের পাঠদানের জন্য কৌশল নির্দিষ্ট করা।

(খ) গৃহকাজগুলি বিশ্লেষণ করে সংগঠন করা।

(গ) বিশেষ মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা।

(ঘ) উপরের সবগুলি।

(২) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?

(ক) স্বাভাবিক শিশু

(খ) প্রতিভাসম্পন্ন শিশু

(গ) মানসিক দিক থেকে পিছিয়েপড়া শিশু

(ঘ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু।

শিখনের ফলাফল

(১) পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবে।

(২) পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠসঞ্চালন করতে পারবে।

(৩) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণাটি বুঝতে পারে।

(৪) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জ্ঞানটি বাস্তব শ্রেণিকক্ষ পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারবে।

৮.৬ শ্রেণিকক্ষ যোগাযোগ এবং শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণের বহুমাত্রা (Communication in the classroom and multiple learning levels in the classroom)

উদ্দেশ্য ঃ

- যোগাযোগের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারা ও সংজ্ঞা জানতে পারা।
- যোগাযোগের সম্পর্কে জ্ঞান গঠন করতে পারা।
- শ্রেণিকক্ষে শিখনের বহুমাত্রা বর্ণনা করতে পারা।

বিষয়বস্তু :

অনেকে যোগাযোগ বলতে বোঝাপড়া বলে মনে করে থাকে। যোগাযোগ হল অন্যের সঙ্গে তথ্য, অভিজ্ঞতা ও ভাববিনিময় করা। Communication বা যোগাযোগ কথাটি গ্রিক ভাষার 'COMMUNIS' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হল সাধারণ। যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষে মানুষে ধারণা, রীতিনীতি ও তত্ত্বের আদানপ্রদান করে সহমত বা অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম হয়।

সংজ্ঞা : Eemey বলেছেন, যোগাযোগ হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ একে অন্যের সঙ্গে অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান ঘটায় যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় উপনীত হতে পারে।

Edgar Dale - এর মতে যোগাযোগ হল পারস্পরিক সহমতের লক্ষ্যে একে অন্যের সঙ্গে ধারণা ও অভিজ্ঞতার বিনিময় বা আদানপ্রদান করা।

যোগাযোগ কথার অর্থ হল যার দ্বারা মানুষ নিজের ভাবকে, অনুভবকে একে অপরের সঙ্গে বিনিময় করে।

বৈশিষ্ট্য :

- যোগাযোগ হল একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। একদিকে থাকে প্রেরক (Communicator) ও অন্যদিকে গ্রাহক (Receiver)। উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়।
- যেকোনো যোগাযোগ ব্যবস্থায় একটি মাধ্যম থাকা আবশ্যক। মাধ্যম বাচনিক (Verbal) বা অ-বাচনিক (Non-verbal) হতে পারে।
- যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটি নির্দিষ্ট আলোচ্যসূচি থাকা প্রয়োজন।
- যোগাযোগ প্রক্রিয়ার দ্বারা উভয়েই যেন পরিতৃপ্তি লাভ করে।

যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উপাদান ঃ

যোগাযোগের উপায়গুলি হল ঃ—

(১) প্রেরক (Sender) ঃ প্রেরকের কাছ থেকে যোগাযোগ প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। সেই বিভিন্ন রকমের ধারণা, চিন্তাভাবনা, মতামত ইত্যাদি প্রেরণ করে থাকে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককেই প্রেরক হিসাবে গণ্য করা হয়।

(২) বিষয়বস্তু (Context) ঃ যে সমস্ত অভিজ্ঞতা, চিন্তাধারা, মতামত, অনুভূতি ইত্যাদি প্রেরক প্রেরণ করে তাকেই বিষয়বস্তু বলে। শ্রেণিকক্ষে পাঠক্রম হল বিষয়বস্তু।

(৩) মাধ্যম (Media) ঃ যে কোনো বিষয়বস্তুকে কার্যকরীভাবে সঞ্চালন করার জন্য উপযুক্ত মাধ্যম একান্ত আবশ্যক। বাচনিক বা অ-বাচনিক দুরকমেরই হতে পারে। বর্তমানে সঞ্চালন কৌশল হিসাবে প্রেরকরা (encoding) এর সহায়তা নিয়ে থাকেন। encoding হল এমন একটি কৌশল যার দ্বারা প্রেরক সাংকেতিকভাবে কিছু বিষয়বস্তু গ্রাহককে সঞ্চালন করেন।

(৪) গ্রাহক (Receiver) ঃ প্রেরক যার উদ্দেশ্যে বার্তা প্রেরণ করেন তিনিই হলেন গ্রাহক। তিনি encoding বার্তা decode করেন এবং সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করেন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরাই হল গ্রাহক।

(৫) ফিডব্যাক (Feedback) ঃ সাধারণ গ্রাহকের প্রতিক্রিয়াকেই ফিডব্যাক বলা হয়। অর্থাৎ কোনো বার্তা গ্রহণ করার পর গ্রাহক কীভাবে সেই বার্তার প্রতি প্রতিক্রিয়া করল তাই হল ফিডব্যাক। এর সাহায্যে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা বিচার করা হয়।

(৬) যোগাযোগের সহায়তা বা বাধাপ্রদানকারী উপাদান যোগাযোগের প্রক্রিয়ায় এমন কিছু বিঘ্নকারী চল (Variable) আছে যেগুলি যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত অথবা বাধাদান করতে পারে। যেমন গ্রাহক ও প্রেরকের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, যোগাযোগের পরিবেশ ইত্যাদি। শিক্ষণের পরিবেশ অনুকূল হলে যোগাযোগ প্রক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকরী হয়। আবার পরিবেশ প্রতিকূল হলে এটি ক্ষণস্থায়ীও হতে পারে।

শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগের বাধা :

(১) যোগাযোগ ব্যাহত হয় যখন বক্তার বাচনশৈলী ও উচ্চারণ পরিষ্কার না হয়। তা হলে বক্তব্য আকর্ষণীয় হয় না।

(২) বক্তার বক্তব্য ও শ্রোতার মানসিক অবস্থার সঙ্গে তার প্রারম্ভিক, জ্ঞান, মনোযোগ, আগ্রহ ইত্যাদির সঙ্গে যদি যুক্ত না হয় তাহলে কিন্তু যোগাযোগের দূরত্ব দেখা দেয় এবং দুপক্ষেরই অসুবিধের সৃষ্টি করে।

(৩) বক্তা যা বলছে, তা যদি পরিষ্কার বা সঠিক না হয়, তখন তার অজান্তেই যোগাযোগের পথে বাধা হয়।

(৪) শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগের সময় বক্তা বা শ্রোতা কেউ যদি মানসিক কারণে বেশি কথা বলে তখন কিন্তু মুখ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনেকসময় কমে যায়।

(৫) অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করলে অথবা দ্রুত এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে চলে গেলে যোগাযোগ কিন্তু ছিন্ন হয়।

(৬) একই বিষয় নিয়ে বারবার বললে কিন্তু একঘেয়েমি এসে যায় ও শ্রোতার মনোযোগ কমে যায়।

(৭) শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ বিভিন্ন কারণে ব্যাহত হতে পারে যেমন— মানসিক, বাহ্যিক শিক্ষণ উপকরণ ও ভাষাজনিত কোনো কারণ।

যোগাযোগের প্রকারভেদ ঃ

যোগাযোগ অনেক রকমভাবে হতে পারে। ১) একজনের সঙ্গে একজনের, ২) একজনের সঙ্গে অনেকের আবার ৩) অনেকের সঙ্গে অনেকের।

সাধারণত যোগাযোগ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় —

(১) **মুখোমুখি যোগাযোগ ঃ** এই ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে একজন বক্তা আর একজন শ্রোতা থাকে তাই এটাকে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি যোগাযোগ বলা হয়। যেমন শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যখন ভাষণ দেয় ও শিক্ষার্থীরা শোনে তখন এই যোগাযোগ সংগঠিত হয়। অনেকসময় মুখোমুখি যোগাযোগকে আন্তর্ব্যক্তিক (Inter-Personal) বলা হয়ে থাকে।

(২) **লেখা ও পড়ার মাধ্যমে যোগাযোগ ঃ** এই ধরনের যোগাযোগে বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি লেখা মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। শিক্ষার্থীরা এখানে লেখকের মনের ভাব সরাসরি প্রত্যক্ষ না করে পরোক্ষে জানে। যেমন লেখকের লেখা পড়ে বোঝে বা আনন্দ পায়। কিন্তু কোনো সংশয় বা প্রশ্ন জাগলে তা লেখকের কাছ থেকে জেনে ওঠার সুযোগ পায় না।

(৩) **দর্শন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যোগাযোগ ঃ** টিভি, সিনেমা, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে বক্তার সঙ্গে শ্রোতার যে সম্পর্ক স্থাপন হয় তা দর্শন — পর্যবেক্ষণ যোগাযোগ বলা যেতে পারে। এখানে দর্শকের সঙ্গে বক্তার সরাসরি কথা বলার সুযোগ না হলেও, শ্রোতারা বক্তার হাবভাব, অভিব্যক্তি ইত্যাদি জানার সুযোগ পায় এবং বক্তার সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক তৈরি হয়।

শ্রেণিকক্ষে বহুমাত্রিক শিখন ঃ

শিক্ষণের মতোন শিখনেরও তিনটি স্তর দেখা যায়, যেমন —

(১) স্মৃতি স্তরে শিখন (Memory level of Learning)

(২) বোধগম্যতার স্তরের শিখন (Understanding level of learning)

(৩) চিন্তন স্তরের শিখন। (Reflective)

স্মৃতি স্তরের শিখন ঃ শিক্ষার্থী যখন বিষয়বস্তুকে কেবল মনে রাখে এবং প্রয়োজনমতো পুনরুদ্রেক করে, তাকেই বলা হয় স্মৃতি স্তরের শিখন। এই ধরনের শিক্ষণের বৈশিষ্ট্য হল —

- বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট এবং ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।
- বিষয়বস্তু উপস্থাপন নির্দিষ্টভাবে হয়।
- বিভিন্ন অংশগুলিকে যান্ত্রিকভাবে বিবেচনা করা হয়।
- এই ধরনের শিখনের ফল স্বল্পস্থায়ী হয়।
- এই শিখন শিক্ষার্থীর মনের উপর চাপের সৃষ্টি করে, শিক্ষার্থীর শিখনের বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে খুব নিম্নমাত্রার মিথস্ক্রিয়া ঘটে।
- শিক্ষার্থীর বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও সময় মতো এবং দরকার মতো তথ্য পুনরুদ্রেক করতে পারে।

বোধগম্যতার স্তরের শিখন : আমরা যখন শিখনের ফলকে প্রয়োজনমতো কাজে লাগাতে পারি তখন বোধগম্যতার স্তরের শিখন বলা হয়। এর তিনটি মানসিক ক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- সংবেদনের ছাপ (Sense impression)
- প্রতিচ্ছবি (Images)
- ব্যথা ও আনন্দের অনুভূতি (Affective elements of learn and pain)

মরিসনের (Morison) মতে বোধগম্যতার শিক্ষণে কীভাবে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতিতে একে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি। এখানে শিক্ষার্থীর তথ্যের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং তথ্যগুলিকে প্রয়োজনমতো প্রক্রিয়াকরণ করতে সক্ষম হয়।

ব্রুনারের মতে (J.S. Bruner) বোধগম্যতার শিখনের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার্থী এখানে শিখনের বিষয়গুলিকে প্রয়োজনমতো তার পূর্বার্জিত বিষয়গুলির সঙ্গে প্রক্রিয়াকরণ করতে সক্ষম হয়। এই ধরনের শিখনে উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্ট হবে। অনুশীলনের ভূমিকা অনুধাবন করতে হবে ও বিষয়গুলির মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য নির্দিষ্ট করতে হবে।

চিন্তন স্তরের শিখন :

চিন্তন স্তরের শিখন সব থেকে উচ্চস্তরের শিক্ষণ, তার কারণ এখানে শিক্ষার্থীর চিন্তন ক্ষমতার সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন হয়। এখানে শিক্ষার্থীকে সব থেকে বেশি সক্রিয় হতে হয়। এখানে শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে। চিন্তন স্তরের শিখনে শিক্ষার্থী বিষয়কে নতুন শ্রেণি এবং ব্যবস্থায় পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়।

এই স্তরের শিখনে ক) সমস্যা অনুধাবনে সাহায্য করে ও খ) সমস্যা সমাধানের উপায়গুলি নির্দিষ্ট করতে অনুপ্রাণিত করে। শিক্ষার্থীদের, শিখনে স্মৃতির মাত্রা, বোধগম্যতার মাত্রা এবং চিন্তনের মাত্রা নির্ভর করে শিক্ষকদের শিক্ষণ মাত্রার উপর।

চিন্তন স্তরের শিক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া হয় আলোচনার ওপর, সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গির উপর, বিষয়বস্তুর সত্যতাকে অনুসন্ধান করা ও শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রশ্নের আবহাওয়া বজায় রেখে, প্রকৃত সমস্যাগুলি নির্দিষ্ট করা এবং তার সমাধানের চেষ্টা করা।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

(১) শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগের বাধা হল —

(ক) শিক্ষকের বাচনশৈলী এবং উচ্চারণে অস্পষ্টতা।

(খ) শিক্ষক যদি একই বিষয় বারংবার বলে।

(গ) শিক্ষক যদি তাঁর বক্তব্য দ্রুত বলে।

(ঘ) উপরের সবগুলি।

(২) যোগাযোগের মাধ্যম —

(ক) শিক্ষক অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চালন করতে পারে।

(খ) শিক্ষার্থী তার শিখন সম্পর্কিত তথ্য শিক্ষককে সরবরাহ করতে পারে।

(গ) শিক্ষক তার আবেগ শিক্ষার্থীদের বোঝাতে পারে।

(ঘ) উপরের সবগুলি।

(৩) শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে নীচের কোনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

(ক) চোখের ভাষা

(খ) মুখের ভাষা

(গ) শরীরী ভাষা

(ঘ) মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি।

শিখনের ফলাফল

- শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করতে পারবে।
- বিভিন্ন প্রকারের যোগাযোগকে শ্রেণিভুক্ত করতে পারবে।
- শ্রেণিকক্ষে শিখনের বহুমাত্রা বুঝতে পারবে।

৮.৭ সারাংশ (Summary)

- একটি বিদ্যালয়কে কার্যকরী বলা যায় বা বলা চলে যখন সেই বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা তাদের বিদ্যালয়কে নিয়ে উচ্চ প্রশংসা করে। তাদের উপস্থিতির হার থেকে তাদের বিদ্যালয়ের প্রতি ভালবাসা, মনোভাব, পরিবেশ সবই ইতিবাচক বলে মনে হয়।
- শিক্ষার মান বলতে বোঝায়, শিক্ষার কোন একটি স্তরে কী পরিমাণে জ্ঞান ওই স্তরের শিক্ষার্থীদের থাকা উচিত। দেশের অগ্রগতি নির্ভর করে শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মানের উপর।
- শিক্ষার ব্যবস্থাপনা তাকেই বলা হয়, যখন শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে চালনা করা যায় এবং অনেক রকমের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয় সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে।
- শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা চার রকমের — স্বৈরতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, উদাসীন এবং নৈরাজ্যমূলক।
- পাঠ-পরিকল্পনা একটি বিশেষ জায়গা অধিকার করে কারণ তা না হলে শিক্ষা সঞ্চালনের কাজ ভাল ভাবে হয় না।
- যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাকে কমিয়ে আনে তাকেই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বলে। এর প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সাধারণ শিশুদের মতন সমান সুযোগ-সুবিধে দেওয়া। সমাজকে এই বিষয় সচেতন করা এবং ব্যতিক্রমী শিশুদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা।

- শিক্ষার কাজ ঠিক মতন তখনই হয় যখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক থাকে। এর জন্য একটি মাধ্যম থাকা একান্ত প্রয়োজন। যোগাযোগ এখানে তিন প্রকারের হয়ে থাকে - মুখোমুখি, লেখাপড়ার মাধ্যম এবং দর্শন ও পর্যবেক্ষণ।

৮.৮ অনুশীলনী (Exercise)

(১) বিদ্যালয়ে কার্যকারিতা পরিমাপ বলতে কী বোঝায়?

(২) বিদ্যালয়ে কার্যকারিতা মাপতে সাহায্য করে এমন কিছু নির্ধারকের নামগুলি লিখুন।

(৩) শিক্ষার মান বলতে কী বোঝায়?

(৪) বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষার উপযুক্ত গুণগতমানের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কী কী করা হয়েছে।

(৫) শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা কী?

(৬) গণতান্ত্রিক শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

(৭) উত্তম ব্যবস্থাপনার নির্ধারক কাকে বলে?

(৮) পাঠ-পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?

(৯) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বলতে কী বোঝায়?

(১০)যোগাযোগ শব্দের অর্থ লিখুন।

(১১)অবাচনিক যোগাযোগ কাকে বলে?

৮.৯ তথ্য উৎস (Reference)

(১) Marmar Mukhopadhyay — Total Quality Mangement in Edu (2nd Ed.) — Sage Publication

(২) Dr. Pranab kr Chakraborty, Dr. Madhumala Sengupta, Dr. Subir Nag & Dr. Dilip Kumar Mondal — Management of Education

অধ্যায় ৯

বিদ্যালয়ে নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনা
(School Leadership and Management)

৯.১ সূচনা (Introduction)

যে কোনো সংগঠনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে সংগঠনের নেতৃত্বের উপর। পরিবার, ধর্মীয় সংস্থা, বাণিজ্যিক সংস্থার মতো বিদ্যালয় একটি সামাজিক সংগঠন। অতএব বিদ্যালয়ের সাফল্যের পিছনে নেতৃত্বের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আবার বিদ্যালয়ের সাফল্যের পিছনে নেতৃত্বের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আবার বিদ্যালয়ের সাফল্য বিবেচনা করা হয় তার উৎকর্ষতা এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের উপর। লক্ষ্য অর্জন তখনই সম্ভব যখন যোগ্য নেতৃত্ব সঠিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ করে। এই অধ্যায়ে আমরা বিদ্যালয়-সম্পর্কিত বিভিন্ন নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা তার সঙ্গে পরিবর্তনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব।

৯.২ প্রশাসনিক নেতৃত্ব (Administrative Leadership)

উদ্দেশ্য :

১। নেতৃত্বের ধারণা ও সংজ্ঞা সম্বন্ধে জানা।

২। নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা।

নেতৃত্বের ধারণা :

নেতৃত্ব হল এক ধরনের কাজ সম্পন্ন করার কৌশল যার দ্বারা কোনো দল একটি সংগঠিত দলে পরিণত হয় এবং দলটি যৌথভাবে কাজ করে। নেতৃত্ব হল একটি দলকে অনুপ্রাণিত করার, উদ্বুদ্ধ করার প্রক্রিয়া যার দ্বারা ওই দলটি সমষ্টিগতভাবে দলগত লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়। সমগ্র প্রক্রিয়াটি একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ একজন নেতা অবশ্যই একজন সফল ব্যবস্থাপক।

নেতৃত্বের সংজ্ঞা :

G.R. Terry-র মতে, নেতৃত্ব হল কোনো দলের সদস্যদের সঙ্গে একটি সম্পর্ক যার প্রভাবে দলের ব্যক্তিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে।

H. Koontz ও O' Donnel -এর মতে, নেতৃত্ব হল ব্যবস্থাপকের একটি ক্ষমতা যা দলের ব্যক্তিদের এমনভাবে প্রভাবিত করে যাতে তারা আত্মবিশ্বাস এবং প্রত্যয়ের সাথে কোনো কাজ সম্পন্ন করে।

উপরের সংজ্ঞা থেকে বলা যায়, নেতৃত্বের দুটি মাত্রা—প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং তার জন্য দলগতভাবে কাজ করা। দলের সদস্যরা যাতে তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্ধারিত কাজে অংশগ্রহণ করে তার জন্য তাদের প্রভাবিত করার প্রক্রিয়াই হল নেতৃত্ব।

ক্রিয়াশীলতার দিক থেকে নেতৃত্ব দুই প্রকারের হয় :

(১) সফল নেতৃত্ব— প্রতিষ্ঠান বা দলের সকলের কাঙ্খিত আচরণ যদি নেতার মধ্যে থাকে তাহলে তিনি সফল নেতা।

(২) কার্যকরী নেতৃত্ব— নেতৃত্ব যদি দলের ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গির দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন করতে পারে, সেটিই হল কার্যকরী নেতৃত্ব। নেতা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে গেলেও ব্যক্তিরা একই প্রেষণা নিয়ে কাজ করতে থাকে।

একথা মনে রাখা দরকার, একজন সফল নেতা কার্যকরী হতেও পারেন বা নাও হতে পারেন। একজন সফল কিন্তু কার্যকরী নয় এমন নেতা যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ প্রতিষ্ঠান ঠিক থাকে। তিনি প্রতিষ্ঠান ছেড়ে গেলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য :

নেতৃত্বের বিভিন্ন দিক আলোচনা করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়

১. নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠান বা দলের লক্ষ্য অর্জনের পথ দেখায়।

২. নেতৃত্ব হল অনুসরণকারীদের মধ্যে আগ্রহ, প্রেষণার সঞ্চার করার প্রক্রিয়া, তাদের প্রভাবিত করার, অনুপ্রাণিত করার প্রক্রিয়া।

৩. নেতৃত্ব পরিস্থিতি নির্ভর। বিদ্যালয়ে কর্তৃত্বসুলভ এবং গণতান্ত্রিক উভয়প্রকার নেতৃত্বের প্রয়োজন। কখনো নির্দেশ প্রদান করতে হয়, কখনো সহকর্মীদের উপদেশ, মতামত গ্রহণ করতে হয়।

৪. নেতৃত্বের গতিশীলতা থাকবে। নেতৃত্ব গতিশীল হলে অনুগামীরাও গতিশীল হবে।

৫. নেতৃত্ব একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। নেতৃত্বের কাজ হল পরবর্তী নেতৃত্ব তৈরি করা।

৬. দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা। নেতৃত্ব নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত এবং সচেতন থাকবে।

৭. যোগাযোগ— নেতৃত্ব অনুগামীদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রেখে চলে।

৮. সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক— নেতৃত্ব এবং অনুগামীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকে।

৯. নেতৃত্ব অনুগামীদের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা জাগায়।

১০. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান—নেতৃত্ব এবং অনুগামীদের মধ্যে মতানৈক্য হবে না। নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য নেতৃত্ব অনুগামীদের সাথে মতের দিক থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবেন।

প্রশাসনিক নেতৃত্ব :

যে কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা সংস্থার কার্যকরী পরিচালনার জন্য সুদক্ষ প্রশাসনের প্রয়োজন। প্রশাসনের দক্ষতা নির্ভর করে প্রশাসনিক নেতৃত্বের দক্ষতার উপর। অর্থাৎ প্রশাসনিক নেতৃত্ব হল সেই নেতৃত্ব যা কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্যাবলি পরিচালনা করে।

প্রশাসনিক নেতৃত্বের শ্রেণিবিভাগ :

১. কর্তৃত্ব সুলভ বা স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব—এই ধরনের নেতৃত্ব অনুগামীদের উপর নির্দেশ দেয়। সদস্যদের অবস্থা বা পরিস্থিতি চিন্তা না করে নেতৃত্ব তাঁর সিদ্ধান্ত বা চিন্তাভাবনা তাদের উপর চাপিয়ে দেন। কোনো আলাপ-আলোচনা হয় না। অনেক সময় শাস্তি দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে সদস্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

সুবিধা—

(ক) এই ধরনের নেতৃত্ব অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

(খ) পরিকল্পনা যথাযথ হলে সহজে এবং কম সময়ে কাজ সম্পূর্ণ করা যায়।

(গ) সকল সদস্যকে একই নির্দেশ দেন।

(ঘ) সদস্যরা কোনো প্রশ্ন করে না, প্রতিবাদ করে না। ফলে অনিশ্চয়তার কোনো অবকাশ নেই।

(ঙ) নেতৃত্ব কর্মবণ্টন করে। ফলে সদস্যরা কে কোনো কাজ করবে তা সুনির্দিষ্ট থাকে।

অসুবিধা—

(ক) সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো কাজ করতে চায় না।

(খ) দৃষ্টিভঙ্গি, তথ্যের অপ্রতুলতা ইত্যাদি কারণে নেতৃত্বের সিদ্ধান্তে ব্যক্তিগত ভুলের সম্ভাবনা থাকে।

(গ) ভয়ের পরিবেশে কাজ করতে হয় বলে প্রতিষ্ঠানে লক্ষ্য অর্জন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(ঘ) সদস্যরা আত্মনির্ভর হয় না, তাদের দায়বদ্ধতা কম থাকে।

(২) **গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব—** একে অংশগ্রহণকারী নেতৃত্বও বলা হয়। এই ধরনের নেতৃত্বে অনুগামীদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ধরনের নেতৃত্ব সবসময় ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে সবকিছু দেখেন। প্রশাসনিক নিয়মকানুন এখানে স্বতঃস্ফূর্ত। নেতৃত্ব এবং সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক যোগাযোগ থাকে।

সুবিধা—

(ক) অনুগামীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।

(খ) সদস্যদের দলের কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকে।

(গ) সদস্যদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, সহযোগিতার মনোভাব, নেতৃত্বের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) এখানে কাজের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধা—

(ক) সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময় লাগে।

(খ) অনুগামীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে শুরু করলে নেতৃত্ব তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

(গ) সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হয়। ফলে পরিকল্পনা রূপায়ণে বিলম্ব হয়।

(৩) **উদাসীন নেতৃত্ব—** এই ধরনের অবাধ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দলের সদস্যরা সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। নেতৃত্ব উদাসীন থাকে। নেতৃত্ব কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করে না।

সুবিধা—

(ক) সদস্যরা অভিজ্ঞতা, দক্ষতা অর্জন করার সুযোগ পায়।

(খ) নেতৃত্বের উপর বিশেষ চাপ থাকে না।

(গ) সদস্যরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়।

অসুবিধা—

(ক) প্রতিষ্ঠানের উপর নেতৃত্বের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

(খ) নেতৃত্বের কোনো দায়িত্ব থাকে না, ফলে সদস্যরা অনুপ্রেরণা পায় না।

(গ) সময় এবং শ্রমের অপচয় হয়।

(ঘ) সদস্যদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখা যায়।

(ঙ) প্রতিষ্ঠান দিশাহীন হয়ে পড়ে।

৪) **পিতৃসুলভ নেতৃত্ব—** এই ধরনের নেতৃত্ব কিছুটা কর্তৃত্বসুলভ এবং কিছুটা গণতান্ত্রিক প্রকৃতির। নেতৃত্ব পিতার মতো সদস্যদের আগলে রাখে। সদস্যদের কাজের, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাও থাকে আবার নিয়ন্ত্রণও থাকে।

বিদ্যালয় প্রশাসনের নেতৃত্ব :

কোনো বিদ্যালয় প্রশাসনের নেতৃত্ব দেন প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা। বিদ্যালয় প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর কাজই হল প্রশাসনিক নেতৃত্বের কাজ।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, একজন প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রশাসনিক দায়িত্বের মধ্যে নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি উল্লেখ্য :

(ক) আর্থিক দায়িত্ব— বিদ্যালয়ের আর্থিক ভাণ্ডার পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের উপর থাকে। বার্ষিক বাজেট এবং দৈনন্দিন আর্থিক বাজেট প্রস্তুত করার দায়িত্বও প্রধান শিক্ষকের উপর থাকে।

(খ) **অফিস সংক্রান্ত দায়িত্ব—** অফিস বিদ্যালয় প্রশাসনের মূলকেন্দ্র। অফিস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের।

(গ) **বিদ্যালয়গৃহ সংক্রান্ত দায়িত্ব—** শ্রেণিকক্ষ, পাঠাগার, পরীক্ষাগার, খেলার মাঠ, পানীয় জল, শৌচাগার ইত্যাদি ঠিকঠাক রাখার দায়িত্বও প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

(ঘ) **পরিচালন সমিতি সংক্রান্ত কাজ—** পরিচালন সমিতি গঠন ও তার কার্যাবলি সঠিকভাবে পরিচালিত করার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের।

(ঙ) **শিক্ষা বিভাগ সংক্রান্ত কাজ—** শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের।

(চ) **শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত দায়িত্ব—** শূন্যপদে নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম পরিচালন সমিতির সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে প্রধান শিক্ষক পরিচালনা করেন।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

১. নেতৃত্বের ধারণা দিন।

২. নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

৩. প্রশাসনিক নেতৃত্বের প্রকারভেদ কী কী?

৪. আপনি কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক নেতৃত্বের কার্যাবলী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করুন। বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক নেতৃত্বের কার্যাবলীর সাথে এর তফাত চিহ্নিত করুন।

শিখনের ফলাফল :

১. শিক্ষার্থী নেতৃত্ব কী তা জানবে।

২. শিক্ষার্থী নেতৃত্বের গুরুত্ব সম্বন্ধে জানবে।

৩. শিক্ষার্থীরা নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে জানবে।

৯.৩ দলগত নেতৃত্ব (Team Leadership)

উদ্দেশ্য : ১. দলগত নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করা।

২. নেতৃত্ব এবং দলগত নেতৃত্বের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারা।

দলগত নেতৃত্ব (Team Leadership)

যখন কোনো ব্যক্তি এক বা একাধিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য একদল ব্যক্তিকে নির্দেশদান ও পরিচালনা করেন তখন তাঁকে দলনেতা বলে এবং তাঁর পরিচালন-কৌশলকে বলা হয় দলগত নেতৃত্ব।

দলগত নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য :

(১) সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের জড় সম্পদ ও মানব সম্পদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ব্যবহারের দ্বারা লক্ষ্য অর্জন করা।

(২) লক্ষ্য অর্জনে দল যে কৌশল নেবে তা নির্দিষ্ট করা।

(৩) দলের সদস্যদের কাজ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া এবং তাদের প্রতিক্রিয়া গুরুত্ব দিয়ে শোনা।

(৪) দৈনন্দিন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

(৫) দলের সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখা।

(৬) দলের মধ্যে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে তার কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।

(৭) দলের কাজের গুণগত মান সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা এবং প্রতিষ্ঠানকে তা জানানো।

নেতৃত্ব এবং দলগত নেতৃত্ব :

একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সদস্যদের প্রভাবিত করার কর্মপ্রক্রিয়া হল নেতৃত্ব।

আবার প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কর্মকাণ্ড সচল রাখার জন্য সদস্যদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে তাদের সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন দলগত নেতৃত্ব। যিনি এই কাজগুলো করেন, তিনি দলনেতা।

ছোট ছোট দলগুলি, তাদের উপর ন্যস্ত কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে তার জন্য প্রয়োজন দলগত নেতৃত্বের। দলগত নেতৃত্ব সফল হলে তবেই প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

১. দলগত নেতৃত্ব বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কীভাবে কাজে লাগে তার ধারণা দিন।

২. নেতৃত্ব ও দলগত নেতৃত্বের মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করুন।

শিখনের ফলাফল :

১. দলগত নেতৃত্বের কার্যাবলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা জানবে।

২. দলগত নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য/গুণাবলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা জানবে।

৯.৪ শিক্ষাবিজ্ঞানমূলক নেতৃত্ব (Pedagogical Leadership)

উদ্দেশ্য: (১) এই ধরনের নেতৃত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধি হওয়া।

(২) এই ধরনের নেতৃত্বের নীতিগুলি সুস্পষ্ট করা।

শিক্ষাবিজ্ঞানমূলক নেতৃত্বের ধারণা :

শিক্ষাবিজ্ঞান বা পেডাগগির অর্থ হল শিক্ষণ-শিখনের প্রক্রিয়াকে বিশদভাবে অধ্যয়ন করা, কীভাবে শিখন হয় তা জানার চেষ্টা করা, শিখনলব্ধ ফলের ভূমিকা অনুধাবন করা।

আর নেতৃত্ব হল, কোনো ব্যক্তি বা দলকে পরিচালনা করার কৌশল।

এই দুই ধারণাকে একত্রিত করে গড়ে উঠেছে, শিক্ষাবিজ্ঞানগত নেতৃত্বের ধারণা যার অর্থ হল শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে অধ্যয়ন করা তাকে সময়োপযোগী করে তোলা এবং সেটিকে সঠিক পথে পরিচালনা করা, তার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া, সর্বোপরি পথপ্রদর্শকের কাজ করা।

শিক্ষাবিজ্ঞানমূলক নেতৃত্বের নীতি :

শিক্ষাবিজ্ঞানগত নেতৃত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল উত্তম শিখন-পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো সৃষ্টি করা। আধুনিক শিক্ষার কেন্দ্রে আছে শিশুশিক্ষার্থী। তার সর্বাঙ্গীন বিকাশই হল আধুনিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত নেতৃত্ব। শিক্ষাবিজ্ঞানগত নেতৃত্ব মূলত কয়েকটি নীতির উপর নির্ভরশীল। সেগুলি হল—

(ক) শিশুশিক্ষার্থীর চিন্তা এবং কৌতূহল প্রকাশের স্বাধীনতার নীতি শিক্ষাবিজ্ঞানগত নেতৃত্ব শিক্ষার্থীদের জন্য এমন শিখন পরিবেশ রচনা করবে যাতে শিশুশিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে এবং তা থেকে উদ্ভূত কৌতূহল প্রকাশ করতে পারে।

(খ) **সময়জ্ঞানের নীতি—** শিক্ষার্থীদের উন্নতমানের শিখনের জন্য শিক্ষকগণ পর্যাপ্ত সময় দেবেন যাতে শিক্ষার্থীরা শিখনে তাদের চিন্তা এবং কৌতূহল ব্যবহার করে নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে পারে।

(গ) **অনুশীলনের নীতি—** শিক্ষাবিজ্ঞানগত নেতৃত্বের দায়িত্ব হল, শিশুশিক্ষার্থীর উপযুক্ত সঠিক শিখন পরিবেশ গড়ে তোলা। সেখানে ব্যক্তিবৈষম্য যেমন গ্রহণ করতে হবে, তেমনি শিশুদের কৌতূহলকে জাগিয়ে তোলা, শিখনের সুযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি করতে হবে, প্রয়োজনে ঝুঁকিও গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) **পেশাদার শিখন কমিউনিটি গড়ে তোলার নীতি—**শিখনে সামাজিক নির্মিতিবাদের মূলকথা হল — ব্যক্তির জ্ঞানার্জন সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। পেশাদার শিখন কমিউনিটির ভিত্তি হল এই সামাজিক নির্মিতিবাদ। শিক্ষাবিজ্ঞানগত নেতৃত্ব এই ধরনের কমিউনিটি গড়ে তুলতে পারে যারা দলগত এবং সমন্বয়মূলক শিখনের প্রতি আগ্রহী এবং এই ধরনের শিখনের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

(ঙ) ভালো ও উন্নত শিক্ষার্থী তৈরি করা যার জ্ঞান নির্মাণে নেতৃত্ব দিতে পারবে।

(চ) পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে তার জ্ঞানের অঙ্গীভূত করতে সক্ষম হবে।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

১. শিক্ষাবিজ্ঞানগত নেতৃত্বের নীতিগুলি কতটা যথাযথ তা আলোচনা করুন।

২. শিক্ষাবিজ্ঞানগত নেতৃত্বের ধারণা দিন। এটি সাধারণ নেতৃত্বের থেকে কতটা পৃথক?

শিখনের ফলাফল :

১. শিক্ষার্থী শিক্ষাবিজ্ঞানগত নেতৃত্ব সম্বন্ধে জানবে।

২. শিক্ষাবিজ্ঞানগত নেতৃত্বের ভূমিকা সম্বন্ধে জানবে।

৯.৫ পরিবর্তনের জন্য নেতৃত্ব (Leadership for change)

উদ্দেশ্য : ১. পরিবর্তনের জন্য নেতৃত্ব সম্পর্কে ধারণা করা।

২. এই ধরনের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা।

পরিবর্তনের জন্য নেতৃত্ব :

সমাজ পরিবর্তনশীল। সময়ের সাথে সমাজের চাহিদাও পরিবর্তনশীল। এই সামাজিক পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি, তার চাহিদার পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করতে পারে শিক্ষা। এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হলে দরকার চিন্তা ভাবনা এবং তার বাস্তবায়নের। যে নেতৃত্ব শিক্ষা সংস্কারের জন্য চিন্তাভাবনা বা দূরদৃষ্টি গড়ে তোলে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাই হল পরিবর্তনের জন্য নেতৃত্ব (Leadership for change)-এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং রূপায়ণ।

পরিবর্তনের জন্য নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যাবলি :-

(১) **ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি** (Vision)—এই ধরনের নেতৃত্বের Vision থাকবে। বর্তমানের উপর ভিত্তি করে আগামী দিনের সামাজিক চাহিদা, শিক্ষার সংস্কার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকবে।

(২) **ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ভাগ করে নেওয়া—** Manassa (1986) -এর মতে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি হল বিকাশ, সঞ্চালন এবং বাস্তবায়নের সমষ্টি। পরিবর্তনের জন্য নেতৃত্ব এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টিকে অন্যদের সাথে ভাগ করে নেয় যাতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়।

(৩) **মানবসম্পদকে মর্যাদাদান—** কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হল—মানবসম্পদ। এই মানবসম্পদকে যথাযথ মর্যাদাদান করতে হলে তাদের প্রতি আস্থা রাখা দরকার। পরিবর্তনের জন্য নেতৃত্ব সবসময় প্রতিষ্ঠানের সমবেত প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দেয়। প্রত্যেক সদস্যের ভূমিকাকে মর্যাদা দেয়।

(৪) **ঝুঁকি গ্রহণ—** এই ধরনের নেতৃত্ব উন্নতির জন্য, পরিবর্তনের জন্য ঝুঁকি গ্রহণ করতে পিছুপা হয় না। প্রয়োজন হলে গতানুগতিক চিন্তাভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন কিছু করার দিকে প্রয়াসী হয়।

(৫) পরিবর্তনের জন্য নেতৃত্ব হল উত্তম শ্রোতা এবং উত্তম যোগাযোগকারী— Foster বলেছেন এই ধরনের নেতৃত্ব ভাষার সঙ্গে অনুবর্তিত। এই ধরনের নেতৃত্ব ধৈর্য্য ধরে শোনা এবং যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে দক্ষ হয়। কারণ যে কোন পরিবর্তনের জন্য এই দুটি দক্ষতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

১. পরিবর্তনের জন্য নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

২. পরির্তনের জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা বলুন।

শিখনের ফলাফল :

১. পরিবর্তনের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে পারবে।

২. পরিবর্তনের জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা জানতে পারবে।

৯.৬ পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা (Change Management)

উদ্দেশ্য : ১. পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা ও অর্থ নির্ধারণ করা।

২. পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি সম্পর্কে জানা।

পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার অর্থ :

এই ধরনের ব্যবস্থাপনা হল এমন একটি গঠনত্মাক প্রক্রিয়া যা কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে বর্তমান অবস্থা থেকে কাঙ্খিত ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যায়।

পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় মূলত তিনটি বিষয় দেখা যায়—

(১) পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন,

(২) পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রণ এবং

(৩) কোনো পরিবর্তনকে কার্যকরী করা।

পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা :

Prosci-র মতে, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা হল একটি গঠনমূলক প্রক্রিয়া এবং একগুচ্ছ উপকরণের প্রয়োগ যার লক্ষ্য হল কাঙ্খিত ফল প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে মানুষকে পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করা।

এককথায় বলা যায় যে, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা মানুষের পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব দেয় এবং তার জন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের নেতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই ধরনের ব্যবস্থাপনা সফলভাবে পরিচালিত হলে প্রতিষ্ঠানের মধ্যম স্তরের সদস্যরা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে সমবেতভাবে কাজ করে। তার ফলে পরিবর্তনগত সুবিধাগুলি সহজে অর্জন করা যায়।

যে কোনো পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন হল পরিকল্পনা এবং তার বাস্তব রূপায়ণ। পরবর্তীকালে এর সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হল পরিবর্তনের লক্ষ্য, কৌশল, সদস্যদের অভিমুখীকরণ, তাদের মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার, আর্থিক জোগান, পরিবর্তনের পর্যায় নির্ধারণ, প্রতিষ্ঠানের কাঠামো পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন ইত্যাদি। এইসব দায়িত্ব গ্রহণ ও তার রূপায়ণই হল পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য।

পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া :

পরিবর্তন ব্যস্থাপনার প্রক্রিয়া বলতে বিভিন্ন কাজকর্মকে বোঝায় যা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনের জন্য প্রয়োগ করা হয়।

Prosci -র মতে পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত—

প্রথম পর্যায়— পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি

(ক) পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার কৌশল ব্যাখ্যা করা।

(খ) উপযুক্ত দল গঠন।

(গ) পরিবর্তন ব্যবস্থাপনাকে কার্যকরী করতে পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা।

দ্বিতীয় পর্যায়— পরিবর্তনের ব্যবস্থা

(ক) প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা করা।

(খ) পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার জন্য সক্রিয় হওয়া।

তৃতীয় পর্যায়— পরিবর্তনকে শক্তিশালী করা

(ক) সদস্যদের ফিডব্যাক সংগ্রহ করা।

(খ) কোনো অসংগতি থাকলে তা চিহ্নিত করা।

(গ) বাধাকে নিয়ন্ত্রণ করা।

(ঘ) প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।

(ঙ) যে কোনো সাফল্যকে স্বাগত জানানো।

Prosci পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ADKAR মডেলের উল্লেখ করেছেন। মডেলটি পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

A— Awareness of the need for change

(পরিবর্তনের চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতা)

D— Deserve to participate and support for change

(পরিবর্তনকে সমর্থন এবং তাতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা)

K— Knowlege on how to change

(পরিবর্তন কেমন করে হবে সে সম্পর্কে জানা)

A— Abilities to implement required Skills and behaviours

(প্রয়োজনীয় আচরণ এবং দক্ষতাকে প্রয়োগ করার ক্ষমতা)

R— Reinforcement to sustain the change

(পরিবর্তনকে স্থায়ী করার জন্য তাকে শক্তিশালী করা)

পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার বাধাসমূহ :

(১) সদস্যদের বাধা।

(২) যোগাযোগের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আসা।

(৩) প্রশিক্ষণের জন্য সময়ের অভাব।

(৪) আর্থিক জোগানের অপ্রতুলতা।

(৫) বাজেট অপেক্ষা অধিক ব্যয়।

(৬) সদস্যদের চলে যাওয়া, নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

(১) পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার অর্থ কী?

(২) পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়ার ধাপগুলি কী কী?

শিখনের ফলাফল :

(১) পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষার্থী জানবে।

(২) পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনার বাধাসমূহ সম্বন্ধে শিক্ষার্থী জানবে।

৯.৭ সারাংশ (Summary)

- নেতৃত্ব হল কর্মসম্পাদনের কৌশল, যার দ্বারা একটি দল যৌথভাবে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে।
- সফল নেতৃত্বের চেয়ে কার্যকরী নেতৃত্ব বেশি ফলপ্রসূ।

- প্রশাসনিক নেতৃত্ব হল সেই নেতৃত্ব যা কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করে।
- প্রশাসনিক নেতৃত্ব অনেক রকমের হয় :
    1. কর্তৃত্বসুলভ বা স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব
    2. গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব
    3. উদাসীন নেতৃত্ব
    4. পিতৃসুলভ নেতৃত্ব
- বিদ্যালয় প্রশাসনে নেতৃত্ব দেন প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা। বিদ্যালয় প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর কাজই হল প্রশাসনিক নেতৃত্বের কাজ।
- যখন কোনো ব্যক্তি এক বা একাধিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য একদল ব্যক্তিকে নির্দেশদান ও পরিচালনা করেন তখন তাঁকে দলনেতা বলে। এবং তাঁর পরিচালনা কৌশলকে বলা হয় দলগত নেতৃত্ব।
- শিক্ষাবিজ্ঞানগত নেতৃত্বের অর্থ হল, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে অধ্যয়ন করা তাকে সময়োপযোগী করে তোলা এবং সেটিকে সঠিক পথে পরিচালনা করা, তার জন্য নির্দেশনা দেওয়া, সর্বোপরি পথপ্রদর্শকের কাজ করা।
- পরিবর্তনের জন্য নেতৃত্বের থাকবে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার ক্ষমতা, মানবসম্পদকে মর্যাদাদান করার ক্ষমতা, ঝুঁকি গ্রহণের সাহস, ধৈর্য্য ধরে সবকিছু শোনার ক্ষমতা, উত্তম যোগাযোগ ক্ষমতা।
- পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় মূলত তিনটি বিষয় দেখা যায়—
    1. পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন।
    2. পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রণ।
    3. কোনো পরিবর্তনকে কার্যকরী করণ।
- পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়ার তিনটি পর্যায়—
    1. পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি
    2. পরিবর্তনের ব্যবস্থা
    3. পরিবর্তনকে শক্তিশালী করা।

৯.৮ অনুশীলনী (Exerise)

1. **সঠিক উত্তরটিতে ✓ চিহ্ন দিন ঃ** প্রশ্নমান-৭

a. সার্থক নেতৃত্বের জন্য আবশ্যক হল—

(ক) প্রযুক্তিগত দক্ষতা (খ) মানবীয় দক্ষতা (গ) অনুধাবনের দক্ষতা (ঘ) উপরের সবগুলি

b. বিদ্যালয় প্রশাসনের প্রধান দায়িত্ব হল—

(ক) প্রধান শিক্ষকের (খ) পরিচালন সমিতির

(গ) সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা দপ্তরের (ঘ) রাজ্য শিক্ষা বিভাগের

c. দলনেতার ভূমিকা হল—

(ক) লক্ষ্য অর্জনের কৌশল নির্দিষ্ট করা

(খ) দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

(গ) শতকরা ৬০ জন সদস্যের দুর্বলতা, প্রেষণা সম্পর্কে অবহিত হওয়া

(ঘ) সদস্যদের সম্বন্ধে খোঁজ রাখা বাধ্যতামূলক নয়।

d. শিক্ষাবিজ্ঞানে নেতৃত্বের জন্য কোন্ বৈশিষ্ট্যটির প্রয়োজন হয় না?

(ক) কৌতূহল (খ) উদার দৃষ্টিভঙ্গি

(গ) প্রখর স্মৃতি (ঘ) উদ্দেশ্যমুখীনতা

২. a) স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়? প্রশ্নমান-২

b) পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?

c) অবাধ নেতৃত্ব কাকে বলে?

d) দলগত নেতৃত্ব কী?

৩. a) অংশগ্রহণকারী নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়? এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কী কী? প্রশ্নমান-৭

b) দলনেতার ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

c) শিক্ষাবিজ্ঞানে নেতৃত্বের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

d) পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়াগুলি উল্লেখ করুন।

৪. a) কোনো সংস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন। প্রশ্নমান-১৬

b) প্রশাসনিক নেতৃত্বের শ্রেণিবিভাগগুলির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করুন।

৯.৯ তথ্য উৎস (References)

১. Educational Administration and Management—J.C. Aggarwal

২. Educational Administration, Management and school Organization—J. Mohanty

৩. Sikshay Byabasthapne O Parikalpana—D.K. Chakraborty

৯.১০ পরবর্তী পঠন (Further Reading)

1. বিদ্যালয় প্রশাসনের পরিকাঠামো।
2. বিদ্যালয়ের নেতৃত্বে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার ভূমিকা।
3. নেতৃত্বের আবশ্যিক দক্ষতাসমূহ।
4. বিদ্যালয় প্রশাসনে প্রধান শিক্ষকের সমস্যাবলি।
5. পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার অসুবিধাসমূহ এবং তার সমাধানের উপায়।

অধ্যায় ১০

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুযোগসুবিধার পরিবর্তন
(Change Facilitation in Education)

১০.১ সূচনা (Introduction)

রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখতে এবং উন্নত জাতীয় জনসমাজ গঠন করতে শিক্ষায় সমসুযোগ দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া উৎপাদনশীল দক্ষ নাগরিক সৃষ্টিতে শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সকল উপযোগিতা পর্যালোচনা করে জাতীয় শিক্ষানীতি শিক্ষায় সমসুযোগ দানের নানা পদক্ষেপ বিভিন্ন সময়ে গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করার প্রচেষ্টা রূপায়ণে নানা কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। যেমন—EFA (Education for all), SSA (Sarva Shiksha Abhiyan) ইত্যাদি। সমাজে লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য নানা প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। সর্বজনীন শিক্ষা বলতে বোঝায় শিক্ষায় সকলের অংশগ্রহণ এবং সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিতকরণ। আলোচ্য এককটির আলোচিত বিষয় হল শিক্ষাকে সর্বজনীন করার উদ্দেশ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষার নানারূপ সংস্কারসাধন। আলোচ্য অধ্যায়ের শেষ অংশে কী কী ধরনের সংস্কার সাধনের মাধ্যমে আমরা শিক্ষাকে বা শিক্ষা প্রক্রিয়াকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারি তা আলোচনা করা হয়েছে।

১০.২ সর্বশিক্ষা অভিযান-অভিজ্ঞতা [Sarva Siksha Abhiyan (SSA) Experience]

উদ্দেশ্য (Objectives) :

আলোচ্য উপএককটি পাঠ করে,

১। শিক্ষার্থী শিক্ষক সর্বশিক্ষা অভিযান কী তা স্মরণ করতে পারবে।

২। শিক্ষার্থী শিক্ষক সর্বশিক্ষা অভিযানের পটভূমি বুঝতে পারবে।

৩। শিক্ষার্থী শিক্ষক সর্বশিক্ষা অভিযানের লক্ষ্য ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত হবে।

বিষয়বস্তু :

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচি গ্রহণ। এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হল — (ক) ৬-১৪ বছর বয়সি সকল শিশুর বিদ্যালয় শিক্ষা সুনিশ্চিত করা। (খ) প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক ক্ষেত্রে সকল প্রকার সামাজিক ও লিঙ্গগত বৈষম্য দূরীকরণ। (গ) সর্বজনীন Retention এবং (ঘ) প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন করা।

সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচি দ্বারা ২,০৭,৯৯৫ নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় অনুমোদিত হয়েছে প্রত্যন্ত এলাকায়। যার মধ্যে ৯৭% বিদ্যালয় ২০১৩-১৪ -এর মধ্যে শিক্ষাদান শুরু করায় ৯৮% গ্রাম্য শিক্ষার্থী ১ কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যালয় যাওয়ার সুবিধা লাভ করেছে।

সর্বশিক্ষা অভিযান শুরু হওয়ায় ১,৫৯,৪৯৯ নতুন উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় অনুমোদন লাভ করেছে। এর মধ্যে ৯৭% বিদ্যালয়ে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। এর দ্বারা গ্রাম্য শিক্ষার্থীদের ৯৬% বাসস্থানের ৩ কিলোমিটার-এর মধ্যে বিদ্যালয় যাওয়ার সুবিধা লাভ করেছে।

সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচি অনুযায়ী ১৬,০৩,৭৮৯ অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ অনুমোদন লাভ করেছে। ২০০৬-০৭ বর্ষের মধ্যে শিক্ষার্থী-শ্রেণিকক্ষের অনুপাত ৩৬ ছিল যা ২০১৩-১৪-এর মধ্যে ২৮-এ দাঁড়িয়েছে।

প্রত্যন্ত গ্রাম এবং দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ৭০৭ টি আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে যার ফলে ৮৬,৭৫০ শিক্ষার্থী উপকৃত হচ্ছে।

সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচির আওতায় ST/SC এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের দু-Set বিদ্যালয়ের পোশাক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচিতে বয়স উপযোগী শিক্ষাদানের জন্য Bridge Course বা বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এতে প্রায় ২.৮ million কখনো বিদ্যালয়ে না আসা এবং Dropout children উপকৃত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় দেশের প্রায় প্রতিটি অংশে বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। প্রায় ১৩৪.৮ million শিক্ষার্থীর ২০১২-১৩ বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত হয়েছে। যদিও বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী নথিভুক্তকরণ পূর্বের (২০১২-১৪) তুলনায় কম হয়েছে, তবে এর কারণ হল ০-৬ বছরের শিশু সংখ্যা কমে যাওয়া। এই কর্মসূচি রূপায়ণের ফলে সামাজিক শ্রেণিবিভাজন প্রাথমিক স্তরে অনেক কমে গেছে। মূলত এই কর্মসূচীর দ্বারা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির গঠনগত (infrastructure) উন্নয়ন হয়েছে। এই কর্মসূচির দ্বারা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সমাজের মূলস্রোতের শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় ১৫.৮% বিদ্যালয়-ছুট কম হয়েছে।

তবে এতদসত্ত্বেও কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ নজর দান এই কর্মসূচির সার্থক রূপায়ণে সহায়তা করবে। যেমন বিদ্যালয়টি-এর পরিকাঠামোগত দুর্বলতা কী কী তা যাচাই করা। শিক্ষার্থীর আধিক্য শ্রেণিকক্ষে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে কি না, শিক্ষার্থী শিক্ষক-এর অনুপাত সঠিকভাবে মানা হচ্ছে কি না, সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন হচ্ছে কি না খতিয়ে দেখা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা। এছাড়া রাজ্য, জেলা ও ব্লক স্তরে IED-এর কার্য পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের একটি আলাদা বিভাগ থাকা উচিত। মূল্যায়ন দ্বারা পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

A. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন —

(i) DPEP-এর পুরো কথাটি হল—

(a) District Primary Education Policy

(b) District Policy for Primary Education

(c) District's progress towards Educations Policy

(d) উপরের কোনোটিই নয়

(ii) সর্বশিক্ষা অভিযান শুরু হয়—

(a) ২০০০-০১ (b) ২০০৫-০৬-এ (c) ২০০৩-০৪-এ (d) কোনোটিই নয়

B. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দিন — (অনধিক ৩০টি শব্দ)

(i) সর্বশিক্ষা অভিযানের দুটি উদ্দেশ্য বলুন।

(ii) বিদ্যালয়-ছুট বলতে কী বোঝেন?

C. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অনধিক ৫০০ শব্দের মধ্যে উত্তর দিন—

(i) আপনারা দলগতভাবে আপনাদের মহাবিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী দুটি বিদ্যালয়ে (প্রাথমিক) ভ্রমণ করে সর্বশিক্ষা অভিযানের রূপায়ণের পাঁচটি বাধাকে চিহ্নিত করে নথিভুক্ত করুন।

শিখন ফলশ্রুতি :

উপএককটি অধ্যয়ন করে,

১। শিক্ষক শিক্ষার্থী সর্বশিক্ষা অভিযান কী তা জানতে পারবে।

২। শিক্ষক শিক্ষার্থী সর্বশিক্ষা অভিযানের লক্ষ্যগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩। শিক্ষার্থী শিক্ষক সর্বশিক্ষা অভিযানের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করতে পারবে।

১০.৩ শিক্ষায় সাম্য (Equity in Education)

উদ্দেশ্য :

আলোচ্য উপএককটি পাঠ করে,

১। শিক্ষার্থী শিক্ষক, শিক্ষায় সমসুযোগ দানের কারণগুলি চিনতে পারবে।

২। শিক্ষার্থী শিক্ষক, শিক্ষায় সমসুযোগদানের জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ জানতে পারবে।

বিষয়বস্তু :

গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রাখার জন্য শিক্ষায় সমতার প্রয়োজন। এছাড়া বৈষম্যহীন, শোষণহীন সবল জাতি গঠন-এর জন্য শিক্ষায় সমতার প্রয়োজন। শিক্ষায় সমতা বলতে বোঝায় জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের শিক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। আর্থিক বৈষম্যের কারণে সমাজে শ্রেণিবৈষম্য দেখা যায়। আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণি সমাজে পশ্চাদপদ শ্রেণি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায়, শিক্ষায় সমতার সংস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিকভাবে দুর্বল, অবহেলিত শ্রেণির মানুষদের ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষায় সমসুযোগের ব্যবস্থা করা দরকার।

শিক্ষায় সমতা রক্ষার অন্যতম উপায় হল শিক্ষার জাতীয়করণ করা। শিক্ষা যাতে অর্থের উপর ভিত্তি না করে শিক্ষার্থীর মেধার ওপর নির্ভরশীল হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সকলের জন্য বিদ্যালয় অবৈতনিক করতে হবে। শিক্ষায় সমতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতীয় শিক্ষানীতি নানা সময়ে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর্থিক সংগতি ও অন্যান্য সুযোগ লাভে বঞ্চিত হওয়ায় তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাদপদ হিসাবে বিবেচিত হয়। এই কারণে শিক্ষায় এদের বিশেষ সুযোগদানের মাধ্যমে বৈষম্যকে লঘু করে দেখানোর প্রচেষ্টায় জাতীয় শিক্ষানীতি সদা তৎপর।

শিক্ষাগত বৈষম্য দূরীকরণে কোঠারী কমিশনের গৃহীত প্রস্তাবগুলি ছিল— সর্বস্তরে শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে হবে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাসামগ্রী প্রদান, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের ছাত্রবৃত্তি প্রদান; তফসিলি জাতি, উপজাতির শিক্ষার জন্য আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, নারীশিক্ষার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে বিশেষ সংগঠন গড়ে তোলা প্রভৃতি।

শিক্ষায় সমসুযোগ প্রদানের জন্য নানা কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। যেমন—সাক্ষরতা কর্মসূচি, সকলের জন্য শিক্ষা, সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচি , বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি ইত্যাদি, এই সকল কর্মসূচি অনুযায়ী ৬-১৪ বছর বয়সি প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা অবৈতনিক

এবং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৯৯৫ খ্রিঃ থেকে মিড-ডে মিলের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। শিক্ষার্থীর নাম নথিভুক্তকরণ এবং বিদ্যালয়-ছুট আটকানোর অভিপ্রায়ে পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা দান করার সংস্থান রাখা হয়েছে শিক্ষানীতিতে।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষায় সমতার জন্য নানা পদক্ষেপ গৃহীত হলেও শিক্ষার মানোন্নয়নের উপযুক্ত সংস্থানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যেমন — বেসরকারীকরণ হবার ফলে আর্থিক স্বচ্ছল শ্রেণি শিক্ষা কিনতে পারছে অন্যদিকে আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণি সেক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। বিদ্যালয়গুলিতে পরিকাঠামোগত অনুন্নয়ন এবং শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত শিক্ষায় সমতার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যা প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০০৫-এর UNESCO Report অনুযায়ী বিদ্যালয়ে শৌচালয় না থাকায় Dropout মেয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষায় সমতা আনার জন্য শিক্ষায় বৈষম্যের মূল কারণগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে এবং সেগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে সমাজ থেকে নির্মূল করতে হবে। বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন শিক্ষায় সমতার সংস্থান গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। এছাড়া নানা Incentive Scheme, বিদ্যালয়ে শৌচালয় স্থাপন নারীশিক্ষাকে উন্নয়নের পথে ধাবিত করেছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখন সমাজে বিশেষ সাড়া ফেলেছে। তফসিলি জাতি, উপজাতিদের জন্য শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ শিক্ষায় সমতা আনার অনুকূল পরিবেশ রচনা করেছে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষায় সমতা আনয়নের উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হল—

(ক) অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে দুর্বল শ্রেণি।

(খ) নারীশিক্ষা ও বালিকাদের শিক্ষা।

(গ) শারীরিকভাবে অক্ষম বা পিছিয়েপড়া শ্রেণির শিক্ষা।

মূলত এই তিনটি দিকের প্রতি যদি আমরা নজর দিতে পারি তাহলে ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে শিক্ষার সাম্যতা আনয়ন সম্ভব। কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ উপরিউক্ত দিকগুলির প্রেক্ষিতে শিক্ষায় সাম্যতা আনয়নে সদা সচেষ্ট। যে দিকটির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া উচিত তা হল micro level-এ পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে।

নিজ অগ্রগতি যাচাই

A. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন—

(i) শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের উদ্দেশ্য হল—

(a) শিক্ষার্থীর রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিকরণ।

(b) শিক্ষার্থীর অর্থনৈতিকতা বৃদ্ধি

(c) শিক্ষায় সমসুযোগ দান।

(ii) শিক্ষায় অসমসুযোগের কারণ বলতে কোনটি বোঝায় না—

(a) দারিদ্র্য (b) সামাজিক বৈষম্য (c) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব (d) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

B. সংক্ষেপে উত্তর দিন — (অনধিক ৩০টি বাক্যে)

(i) শিক্ষায় সমসুযোগ বলতে কী বোঝায়?

(C) অনধিক ৫০০টি শব্দে উত্তর দিন—

(i) আপনার পরিচিত কোনো শারীরিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর সহিত দেখা করে তার সহিত তার শ্রেণি কক্ষজনিত অসুবিধাগুলির কথা আলোচনা করে লিপিবন্ধ করুন।

(ii) আপনার পরিচিত কোনো উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত বালিকা শিক্ষার্থীর সহিত আলোচনা করে তার সরকারি সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধাগুলির লিপিবন্ধকরণ করুন।

শিখন ফলশ্রুতি :

উপএককটি অধ্যয়ন করে,

১। শিক্ষার্থী শিক্ষক শিক্ষায় সমসুযোগদানের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করতে পারবে।

২। শিক্ষার্থী শিক্ষক শিক্ষায় সমসুযোগ দেওয়ার কারণগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১০.৪ বালিকাদের জন্য উদ্বোধক ও উৎসাহদান কর্মসূচি (Incentives and Schemes for girl Children)

উদ্দেশ্য :

আলোচ্য উপএককটি পাঠ করে,

১। শিক্ষার্থী শিক্ষক প্রাচীন ভারতে মহিলাদের শিক্ষা/নারীশিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

২। শিক্ষার্থী শিক্ষক নারীশিক্ষার সমস্যার সমাধান করতে সচেষ্ট হবে।

বিষয়বস্তু :

নারী জাতি সমাজের একটি বড় অংশ অধিকার করে আছে। নারী জাতির উন্নয়ন ব্যতীত সমাজের উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বৈদিক সভ্যতায় ঘোষা, অপালা, মৈত্রেয়ী তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান প্রতিফলিত করে। বৈদিক পরবর্তী যুগ থেকে নারী সমাজে অবহেলিত হতে থাকে। ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে শিক্ষিত সম্প্রদায় নারীমুক্তি আন্দোলনে ব্রতী হয়। কেবলমাত্র শিক্ষার দ্বারা নারী স্বাবলম্বী হতে পারে এবিষয় অনুধাবন করে বিভিন্ন মনীষী যেমন—রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখ নারীশিক্ষার প্রসারে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

বর্তমানে শিক্ষানীতিতে মেয়েদের প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ে নানাভাবে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এবং কর্ম ক্ষেত্রে সংরক্ষণ শিক্ষায় নারীর অধিকার লাভ সুনিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। নারীশিক্ষার উন্নয়ন ও লিঙ্গানুপাত রোধ করতে বিভিন্ন Scheme যেমন 'মহিলা সমাখ্যা' কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়, NP-NSPE অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এছাড়া আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং আর্থিক সাহায্য প্রদান শিক্ষাক্ষেত্রে নারীকে সাবলীল করে তুলছে। Tata Institute of Social Science-এর সহায়তায় মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যে আবাসিক মহিলা বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সকল স্থানে নারীশিক্ষার হার ৫০%-এর কম সেখানে আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়। তপশিলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কন্যা শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের দ্বারা বিদ্যালয়ে তাদের নাম নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। Merit cum Scholarship দ্বারা শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ের Incentive Scheme অনুযায়ী ১৮ বছরের শিক্ষার্থীদের (কন্যা) ৩,০০০ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্প নারীশিক্ষার বিকাশের সহায়ক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প কন্যা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করেছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী ১৮ বছরের বেশি বয়স্ক

কন্যা-শিক্ষার্থী ২৫,০০০ টাকা অর্থ সাহায্য পায় এবং অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের কন্যা শিক্ষার্থী বার্ষিক ৫০০ টাকা আর্থিক অনুদান পায়। এক্ষেত্রে পারিবারিক আয় বার্ষিক ১,২০,০০০ টাকার মধ্যে হওয়া প্রয়োজন। এই প্রকল্প রূপায়ণের ফলে বাল্যবিবাহ যা সমাজের উন্নয়নের পথে এক বড় অন্তরায় তা রদ সম্ভব হয়েছে। এছাড়া কন্যা শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য, শিক্ষাগত মান বৃদ্ধি সমাজে নারীর ক্ষমতায়নকে সুনিশ্চিত করেছে।

নারীশিক্ষার বিকাশে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হলেও সমাজে নারী আশানুরূপ মর্যাদা লাভ করতে পারেন এখনও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে লিঙ্গানুপাত, কন্যাভ্রূণ হত্যা ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে খাটো করে রেখেছে। নারীশিক্ষার অন্যতম অন্তরায় হল সমাজের কুসংস্কার, গোঁড়ামি, শিক্ষা চেতনার অভাব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত এলাকায় কন্যা শিক্ষার্থীদের পরিবার তাদের শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া আর্থিক অনটনের শিকার হয়েও অনেক পরিবার কন্যা শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষা লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

নারীশিক্ষাকে অবৈতনিক করা, মহিলাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন, সামাজিক নিরাপত্তাদান সর্বোপরি সমাজের অধিকাংশ শিক্ষা চেতনা এ দেশের নারীশিক্ষার পথ সুগম করতে পারে।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

A. সঠিক উত্তরটি বেছে লিখুন

(i) কস্তুরবা গান্ধী শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল—

(a) মহিলাদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা

(b) মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান

(c) মহিলাদের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি করা

(d) অনুন্নত এলাকায় মহিলাদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি।

(ii) কন্যাশ্রী প্রকল্প কোন রাজ্যে প্রচলিত

(a) ওড়িশা (b) পশ্চিমবঙ্গ (c) উত্তরপ্রদেশ (d) রাজস্থান।

B. সংক্ষেপে উত্তর দিন—(অনধিক ২০০ শব্দে)

(i) নারীশিক্ষার সমস্যাগুলি আলোচনা করুন।

(ii) নারীশিক্ষার প্রসারে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে—আপনার যুক্তি দিয়ে লিখুন।

শিখন ফলশ্রুতি :

উপএককটি অধ্যয়ন করে,

১। শিক্ষক শিক্ষার্থী প্রাচীন ভারতে নারীশিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২। শিক্ষক শিক্ষার্থী ভারতে নারীশিক্ষার সমস্যাগুলি আলোচনা করতে পারবে।

১০.৫ শিক্ষাক্ষেত্রের ও বিদ্যালয়ের সংস্কারমূলক শিক্ষা (Issues in Educational and School reform)

উদ্দেশ্য :

উপএককটি অধ্যয়ন করে,

১। শিক্ষার্থী শিক্ষক শিক্ষা সংস্কার/সংস্করণ বলতে কী বোঝায় তার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারবে।

২। শিক্ষার্থী শিক্ষক বিদ্যালয় সংস্করণের সুবিধাগুলি সনাক্ত করতে পারবে।

বিষয়বস্তু :

সময়ের সাথে সাথে এগিয়ে চলার জন্য সংস্কারসাধন প্রয়োজন। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পূর্বে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল শিক্ষককেন্দ্রিক এবং বিদ্যালয়গুলি সেইমত ভাবে গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত হওয়ায় নতুন শিক্ষণ কৌশল গৃহীত হচ্ছে এবং এর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভূত উন্নয়ন ও সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে। নিরক্ষরতা একটি সামাজিক ব্যাধি এ কথা উপলব্ধি করে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিটি দেশের প্রতিটি নাগরিকের সুনিশ্চিত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার পরামর্শ প্রদান করেছে। বর্তমানে বিশ্বায়নের ফলে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত সংস্কারসাধন প্রয়োজন। নিম্নলিখিত কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিদ্যালয়ের সংস্কারসাধন সম্ভব—

প্রথমত, শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন প্রয়োজন। **Convergent** শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় থাকে, ফলে শিখন সম্পূর্ণ হয় না অন্যদিকে **Divergent** শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীর শিখনের শর্তগুলি পূরণ করতে সক্ষম হয়, তাই এই শিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ শিক্ষার্থীর মনে বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গঠনে সহায়তা করে একারণে বিদ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত শিক্ষণ সহায়ক উপাদান থাকা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা প্রক্রিয়ায় বহুধা মাধ্যমের ব্যবহার শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে উন্নত করে। এজন্য বিদ্যালয়ে কম্পিউটার, প্রোজেক্টর প্রভৃতি প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয় ও অন্যান্য সংস্থার মধ্যে সংযোগ স্থাপন প্রয়োজন। এই জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতনদের সচেষ্ট হওয়া দরকার। বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি গ্রহণে ও রূপায়ণে সদর্থক মনোভাব পোষণ প্রয়োজন।

চতুর্থত, অনেক সময় দেখা যায়, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত অনুন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়ছুট-এর সংখ্যা বাড়ে, যে ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো সংস্কারের প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গড়ে তোলা, Laboratory, common room প্রভৃতি নির্মাণের প্রয়োজন।

পঞ্চমত, দলগত শিক্ষা শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের সহায়ক এজন্য বিদ্যালয়ে Workshop, Seminar-এর ব্যবস্থা করা এবং এজন্য কক্ষ নির্মাণ করা প্রয়োজন।

ষষ্ঠত, হাতেকলমে শিক্ষা (learning by doing) শিক্ষার্থীর আত্মসক্রিয়তা বৃদ্ধি করে যা শিখনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, এজন্য বিদ্যালয়ে মুক্ত শ্রেণিকক্ষ স্থাপন করা প্রয়োজন।

সপ্তমত, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংস্থা যেমন গ্রাম পঞ্চায়েত, B.D.O, আঞ্চলিক সভার সাথে সংযোগ রেখে সামাজিক উন্নয়ন করা প্রয়োজন, এজন্য শিক্ষাবর্ষে কিছু নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে meeting -এর প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ের তথা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নকল্পে শিক্ষালয়ের পরিবর্তনসাধন প্রয়োজন এবং এই সম্পর্কে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

A. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন—

(i) নিচের কোনটি বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়—

(a) সংস্কারের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা।

(b) সংস্কারের জন্য সমর্থন সংগ্রহ করা।

(c) সংস্কার প্রচেষ্টার ফল সম্পর্কে অবহিত করা।

(d) কোনোটিই নয়।

(ii) বিদ্যালয়ের সংস্কারের ক্ষেত্রগুলি হল—

(a) শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া

(b) বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা

(c) শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মূল্যায়ন

(d) উপরের সব কটিই।

B. অনধিক ৫০০ শব্দে উত্তর দিন—

(i) আপনার মতে বিদ্যালয়ের কোন্ কোন্ দিকের সংস্কারসাধন প্রয়োজন? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে অবশ্যই গুরুত্বদান করবেন।

শিখনের ফলশ্রুতি

১। শিক্ষার্থী বিদ্যালয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবে।

২। শিক্ষার্থী শিক্ষক বিদ্যালয় সংস্করণের অসুবিধাগুলি প্রকাশ করতে সমর্থ হবে।

১০.৬ শিক্ষায় পরিবর্তনমূলক বিষয়সমূহের সহায়তার প্রস্তুতি (Preparing for and facilitating change in Education)

উদ্দেশ্য :

উপএককটি অধ্যয়ন করে,

১। শিক্ষক শিক্ষার্থী শিক্ষাসংস্কার কী তা বুঝতে পারবে,

২। শিক্ষক শিক্ষার্থী শিক্ষা সংস্কারের কারণগুলি প্রকাশ করতে পারবে।

বিষয়বস্তু :

শিক্ষা প্রক্রিয়া সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার এই পরিবর্তন সর্বদা প্রগতিশীল তাই এই পরিবর্তনকে সংস্কারসাধন বলা হয়। শিক্ষাসংস্কার একটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া।

সমাজের মানুষের স্বার্থে শিক্ষা প্রক্রিয়া ও শিক্ষালয় গড়ে তোলা হয়েছিল। সম্পদের অসম বণ্টনে সমাজে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে। যে কোনো একটি শ্রেণি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়, একথা স্মরণ রেখে

সমাজের উৎকর্ষসাধনের জন্য শিক্ষাকে সমাজের সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। যাতে শিক্ষাকে হাতিয়ার করে সমাজের শ্রেণিবৈষম্য দূর করা যায়, এছাড়া শিক্ষা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশসাধন করে তাকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ প্রদান করে। ব্যক্তির গুণে বিকাশ সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সহায়ক। অতএব শিক্ষার সংস্কারসাধন প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সমাজের পিছিয়েপড়া শ্রেণির বিকাশের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ST, SC, OBC, BPL শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন করতে বদ্ধপরিকর। অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যেমন—

(a) অনগ্রসর শ্রেণির জন্য বিনামূল্যে পাঠ্য বই, ইউনিফর্ম, স্কুলের ব্যাগ দেওয়া ইত্যাদি।

(b) তফসিলি জাতির ছাত্রছাত্রীর জন্য স্নাতকস্তর পর্যন্ত ফি সরকার দেয়।

(c) শিক্ষাক্ষেত্রে এবং চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ সংরক্ষণ -এর ব্যবস্থা করেছে।

(d) SSA (সর্বশিক্ষা অভিযান), EFA (সকলের জন্য শিক্ষা) NAEP (জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা প্রোগ্রাম) প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করে শিক্ষা সংস্কার করছে।

বর্তমান সভ্যতা নানা বাধার সম্মুখীন, যেমন—জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, নিরক্ষরতা, পরিবেশের অবনমন, লিঙ্গ বিভাজন ইত্যাদি। এই সকল সমস্যার সমাধানের জন্য শিক্ষার সংস্কার প্রয়োজন।

সকলের জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য UNESCO একটি রিপোর্টে ব্যাখ্যা করে। এগুলি হল — জীবনব্যাপী শিক্ষা, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ, গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস এবং আন্তর্জাতিক ঐক্য স্থাপন।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিতকরণের জন্য সরকারি, আধা সরকারি এবং বেসরকারি সকল প্রকার উদ্যোগকে সাদরে গ্রহণ করেছে। তবে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার সবচেয়ে দ্রুত সাফল্য লাভ করেছে।

সংস্কারের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি বিশেষ নজর দেওয়া দরকার সেগুলি হল—

(১) শিক্ষার্থী যেন তার বই-এর জ্ঞানকে বাইরের জ্ঞান/ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত করতে পারে।

(২) শিশুকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে বুঝতে হবে।

(৩) শিক্ষার্থীর মধ্যে গ্রহণ করার ও নিরবচ্ছিন্নভাবে শেখার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

(৪) শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে উৎপাদনশীল কার্যক্ষমতা বা হাতেকলমে কাজ করার অভিজ্ঞতাকে ও দক্ষতাকে গুরুত্বদান করতে হবে।

নিজ অগ্রগতি যাচাই :

A. সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন

(i) শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্য হল—

(a) সমাজ পরিবর্তনের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা

(b) সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করা

(c) শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নসাধন

(d) উপরের সবকটিই

(ii) শিশুকে গুরুত্বদান করা উচিত—

(a) দৈহিক ক্ষমতার বিচারে

(b) মানসিক ক্ষমতার বিচারে

(c) সামাজিক ও সংস্কৃতিক পরিবেশের বিচারে

(d) উপরের সবকটিই

B. সংক্ষেপে উত্তর দিন—(দুটি বা তিনটি বাক্যে)

(i) শিক্ষা সংস্কার বলতে কী বোঝেন?

(ii) শিশুর অজ্ঞতা বলতে কী বোঝেন?

C. অনধিক ৫০০ শব্দে উত্তর দিন

(i) শিক্ষা সংস্কারের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় বন্ধুদের/সহপাঠীদের সহিত আলোচনা করে লিপিবন্ধ করুন।

শিখনের ফলশ্রুতি :

আলোচ্য উপএককটি অধ্যয়ন করে,

১। শিক্ষার্থী শিক্ষক শিক্ষা সংস্কারের কারণগুলি আলোচনা করতে সক্ষম হবে।

২। শিক্ষার্থী শিক্ষক শিক্ষাব্যবস্থায় সুযোগ প্রদানের জন্য সংস্কারসাধন ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১০.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

২০০০ সালের ডাকার সম্মেলনের পর ২০০০-০১ সালে প্রাথমিক শিক্ষার (Elementary Education) উন্নয়নের জন্য সর্বশিক্ষা অভিযান ভারতবর্ষে গ্রহণ করা হয় এবং ২০১৫ সালে ২০১৪ সালের EFA - Towards Quality with Equality -এ দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষ প্রাথমিক শিক্ষাতে উল্লেখযোগ্যভাবে সাফল্য লাভ করেছে। তবে তারপরও বিশেষ কিছু কিছু দিকে আরও নজর দেওয়া দরকার তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মূল্যায়ন প্রক্রিয়া (CCE)। শিক্ষায় সাম্য একটি বৃহত্তর ও কঠিন ধারণা। বিভিন্ন ধরনের বাধা এই সাম্যতা আনয়নের ক্ষেত্রে দেখা যায়। বিশেষত, Inclusive Education -এর উপর বিশেষ নজর দেওয়া দরকার, বালিকাদের জন্য রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রকমের Schemes ও Incentives চালু করেছে তবে নিম্নস্তর পর্যন্ত তা পৌঁছানোর জন্য আরও বেশি সচেতনতা ও প্রচার প্রয়োজন। বর্তমান রাজ্য সরকার যাতায়াতের সুবিধার জন্য সাইকেল প্রদান করছে যা মেয়েদের শিক্ষাপ্রাঙ্গণে বা শিক্ষালয়ে যাতায়াতে বাধা দূর করতে সক্ষম। শিক্ষামূলক সংস্কারকে আমরা প্রধানত দুটি দিক থেকে দেখতে পারি,

(ক) বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন সংক্রান্ত সংস্কারসাধন। (খ) বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সংস্কার। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারসাধন করে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল মহিলা শৌচাগার নির্মাণ। রাজ্য সরকার শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ার মূল্যায়নে বিশেষ পদক্ষেপ হল Peacock Model of Evaluation. উক্ত অধ্যায় শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিবর্তনশীলতার দিকগুলি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সহিত আলোচিত হল।

১০.৮ অনুশীলনী (Exercise)

১. সর্বশিক্ষা অভিযান কী? এই অভিযানের লক্ষ্য ও ক্রিয়াকলাপগুলি আলোচনা কর।

২. শিক্ষায় সাম্যর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

৩. শিক্ষাক্ষেত্রে ও বিদ্যালয়ের কী কী সংস্কারমূলক কাজ করা সম্ভব আলোচনা কর।

৪. শিক্ষায় পরিবর্তনমূলক বিষয়সমূহের সহায়তার জন্য কী কী প্রস্তুতি নেওয়া যায়?

১০.৯ তথ্য উৎস (Reference)

১. NUEPA (২০১৪) Education for all : *Towards Quality with Equity* : New Delhi, India : Author.

২. *Education in India (NSOU & KSOU Study Material, ODL mode)*. (২০১৩). Kolkata, India : NSOU School of Education.

৩. *National Curriculum Framework* ২০০৫ (১st ed.). (২০০৫). New Delhi, India : Author.

৪. www.mhrd.gov.in retrieved in ১২.০২.২০১৬.

৫. www.ssa.nic.in retrieved in ১৪.০২.২০১৬.

৬. https://en.wikipedia.org/wiki/**Educational equity** retrieved in ১৫.০২.২০১৬

১০.১০ পরবর্তী পঠন (Further Reading)

১. *National Curriculum Framework* ২০০৫ *(Problems of the Schedule Caste and Schedule Tribe Children)*. (১st ed.). (২০০৬). New Delhi, India : Author.

২. *National Curriculum Framework* ২০০৫ *(Gender Issues in Education)*. (১st ed.). (২০০৬). New Delhi, India : Author.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ